উত্তরবেদ ও পরমপদ

শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়-বিবৃত

প্রথম সংস্করণ

১৯২০

ঢাকা, বাঙ্গালাবাজার
প্রফুল্ল-কুমুদ লাইব্রেরী হইতে
শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র



৯। ১০ বংসাল রোড, ঢাকা।
রামসুন্দর রাধাশ্যাম ষ্টীম্ মেশিন প্রেসে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



সূচীপত্র

১। উত্তরবেদ

গোড়ার কথা

২। পরমপদ

লাভের উপায়

মুখবন্ধ

ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে অভীপ্সিত বর গ্রহণ করা—বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষত্ব। পৌরাণিক যুগে এই 'আকর্ষণ' রূপ সাধন-পথটা বিশেষ প্রশস্ত হইয়া পড়ে; এবং পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দতা পূর্ণ ও অব্যাহতভাবে ভোগ করিবার জন্য একটা প্রবল চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। এই যুগেই স্বর্গমর্ত্ত্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধিত হইয়াছিল—অদ্ভুতকর্ম্মা রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারের অবতারণা হইয়াছিল।

কিন্তু বেদান্তের যুগ হইতে জগৎ 'মিথ্যা' হইতে আরম্ভ করে—পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দতার পূর্ণতা সাধনের দিক্ হইতে, মর্ত্ত্যকে স্বর্গে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতে, মানুষের দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে থাকে; না, ক্রমে জগৎ মিথ্যাই হইয়া বসে এবং জগৎ-ছাড়া ব্রহ্মই "সচ্চিদানন্দ" হইয়া পড়েন! আকর্ষণের পরিবর্ত্তে এই যুগ হইতে "বিকর্ষণের"—ত্যাগের—প্রভাবই সমাজ-হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিতে থাকে।

কিন্তু মিথ্যা বলিয়া জগৎটাকে উড়াইতে গেলেই যে জগৎটা উড়িয়া যাইবে, তাহা নহে।' বৈদান্তিকের কূটতর্ক, যুক্তি-জাল ও "মোহ-মুদ্গারের" হাত এড়াইয়া, কামিনী-কাঞ্চন সমান ভাবেই আজ পর্য্যন্ত মানব-হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে।

ইহা বুঝিয়াই তান্ত্রিকযুগে একটা 'মধ্য পথ' বাহির করিবার চেষ্টা করা হয়। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' হইলেও, তান্ত্রিক সাধক জগৎটাকে একেবারে উপেক্ষা করেন নাই। 'আকর্ষণ ও ত্যাগ' এই

উভয়ের সংমিশ্রণ করিয়া তিনি পার্থিব ভোগের ভিতর দিয়াই ত্যাগের অভিলক্ষিত দেশে পৌঁছিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে বেদান্তের 'নেতির' প্রভাবটা অনেক মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে সত্য কিন্তু একেবারে দূরীভূত হয় নাই। ফলে, একদিকে 'পরব্রহ্মের' ও অপরদিকে জগতের বিপরীত আকর্ষণের মাঝখানে পড়িয়া হিন্দুজাতি ত্রিশঙ্কুর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে!—জগতে তাহার স্থান ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, ওদিকে 'তুরীয়ে' যাইয়া যে স্থিরতা লাভ করিবে, তাহাও হইতেছে না, কারণ তাহা হইবার নহে!

আর এক কথা, বৈদিক যুগ হইতে যে আকর্ষণের প্রথা চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে বিষম একটা ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে—মায়া স্বীকার করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা ও আকর্ষণের শক্তি খর্ব্ব ও সীমাবদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে। তন্ত্র সেই ত্রুটিটাকে বিশেষ পুষ্ট ও বলবান্ করিয়া তুলিয়াছে। মায়ার চশ্‌মা পড়িয়া সুখের পাশে আমরা দুঃখের চিত্র দেখিতে পাই, এবং মনে করি, সুখ এবং দুঃখ উভয়ই সসীম অতএব অস্থায়ী। আকর্ষণ করিবার সময় তান্ত্রিক এই ভাব লইয়াই আকর্ষণ করেন—সুখসৌভাগ্য সীমাবদ্ধ করিয়া লইয়া তিনি সুখসৌভাগ্যের কামনা করেন। কাজেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ অপূর্ণ ও অস্থায়ী সুখসৌভাগ্যই তাহার লাভ হয়। সুধু তাহাই নহে, সুখের সঙ্গে সঙ্গে আবার অজ্ঞাতসারে দুঃখেরও আকর্ষণ হইয়া থাকে। তাহার কল্পিত ঐশীমূর্ত্তি সাধারণতঃ দ্বন্দ্বে গঠিত—পালন ও সংহার এই উভয় ভাব লইয়া তাহার ইষ্টমূর্ত্তি তাহার চক্ষুর সম্মুখে বিরাজমান; একদিকের হস্তে দেবতা তাহাকে বর ও অভয় দান করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে অপরদিকের হস্ত দিয়া তাহার শত্রু ও বিঘ্ন বিনাশ করিতেছেন। কাজেই এই ভাবে সাধন করিতে বসিয়া সাধক ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে জীবন ও মৃত্যু একই সঙ্গে আকর্ষণ করিতে থাকেন.

এবং ফলে উভয়ই লাভ করিয়া থাকেন। তাই তাহার ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হয়, কখনও হয় না ; এবং এইভাবে সিদ্ধি-অসিদ্ধির তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে ডুবিতে ডুবিতে অবশেষে তিনি একেবারেই তলাইয়া যান !

আকর্ষণই মহামন্ত্র—একমাত্র মন্ত্র। জগৎকে স্থায়ী বলিয়া মনে করা—জগতের সুখ দুঃখ সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া, মায়ার কার্য্য নহে ; মানুষের ভিতর যে ঈশ্বরত্ব—চৈতন্য ও স্বাধীন ইচ্ছা—বিদ্যমান,ইহা সেই ঈশ্বরত্বেরই আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা। তাঁহারই চৈতন্যে চৈতন্যময় ও স্বাধীন-ইচ্ছা-সম্পন্ন মানুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিবার জন্য ভগবান্ মায়ার মুখোস পরিয়া বসেন নাই। অন্য কোনও অনীশ্বরী শক্তিও যে মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া ঈশ্বরের দিক্ হইতে তাহার দৃষ্টি নশ্বর জগতের দিকে ফিরাইবার জন্য এই খেলা খেলিতেছে, তাহা নহে। তাঁহার সৃষ্টির যে অংশকে ঈশ্বর চৈতন্য ও স্বাধীন ইচ্ছা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, সেই 'জড় জগতের' সৃজন পালন ও বিলয়ের জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। এই যে প্রাকৃতিক বিধান ইহাদেরই সাধারণ নাম—মায়া। এই মায়ার প্রভাবেই সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে পৃথিবী ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন করিতেছে, এবং পার্থিব বস্তুর নশ্বরতা আমাদিগকে ব্যথিত করিয়া আসিতেছে। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছা-সম্পন্ন মানুষের জন্য মায়া অভিপ্রেত নহে। সে যে আপনার স্বাধীন ইচ্ছার কথা বিস্মৃত হইয়া আপনাকে প্রাকৃতিক বিধানের অধীন করিয়া ফেলিয়াছে, ইহাই তাহার মায়ার হাতে আত্মসমর্পণ এবং তাহার সকল দুঃখের কারণ। স্বাধীন ইচ্ছার বলে সে আপনার অভীপ্সিত বস্তু আকর্ষণ করিয়া অনন্তকাল ভোগ করিতে পারে, প্রাকৃতিক বিধান অতিক্রম করিয়া যথেচ্ছ জীবনযাপন করিতে পারে। অতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি (miracles) এই স্বাধীন

ইচ্ছা ও ইচ্ছার আকর্ষণী শক্তিরই ফল। এই অতিপ্রাকৃতিক জীবন যাপনই মানুষের জীবনের লক্ষ্য। ইহা বিস্মৃত হইয়া সে প্রাকৃতিক বিধানের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে,মায়া স্বীকার করিয়া আপনাকে জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

জগৎ মিথ্যা—সুখ ও দুঃখ পরস্পরের দ্বারা সীমাবদ্ধ অতএব উভয়ই অসার, অস্থায়ী ও মিথ্যা—তাহার এই যে ধারণা অথবা বিশ্বাস ইহাই মায়ার কার্য্য,ইহাই অজ্ঞান। সুখের পাশে দুঃখের চিত্র ফুটাইয়া রাখিয়া সুখ আকর্ষণ করিলে অথবা সুখ এবং দুঃখের অতীত একটা পরম সুখের—আনন্দের—অবস্থা কল্পনা করিয়া লইয়া তাহার পিছনে ঘুরিলে 'দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি' কখনই লাভ হইতে পারে না অজস্র ধারায় অফুরন্ত সুখ আকর্ষণ করিতে পারিলে, ভগবৎ-ভাণ্ডারের সঙ্গে সংযোগ সাধন করিয়া আপনার ইচ্ছা-শক্তি অজেয় করিয়া লইতে পারিলেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি—মোক্ষ—লাভ হইয়া থাকে; দেবতা না হইয়া মানুষ প্রকৃত মানুষ হইতে পারে। ইহাই তাহার লক্ষ্য—ইহাই তাহাকে সাধন করিতে হইবে।

বেদের মন্ত্র—আকর্ষণ; বেদান্তের মন্ত্র—বিকর্ষণ। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে মানুষের স্থান দেবতারও উপরে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; বেদান্তের যুগ হইতে সে ক্রমশঃ পশুর স্তরে নামিয়া আসিতেছে—আপনার ইচ্ছা-শক্তির পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া ও মায়ার হাত এড়াইতে যাইয়া সে 'মায়ার" হাতের পুতুলই হইয়া বসিতেছে! উত্তরবেদ আবার বৈদিক মন্ত্র "আকর্ষণের" দিকে তাহাকে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা। যাহাতে আবার মানুষ বিশ্ব-শক্তির কেন্দ্র-স্বরূপ হইয়া বসিতে পারে—অমোঘ ইচ্ছা-শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া আপনার অঙ্গুলি সঙ্কেতে বিশ্ব চালিত করিতে পারে—তাহার কথাই উত্তরবেদ।

উত্তর বেদ

গোড়ার কথা

প্রথম—ত্যাগের কথা ; আকর্ষণ ও গ্রহণের কথা

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে আকর্ষণ-রূপ মহামন্ত্রের প্রভাব লক্ষিত হইয়াছিল। তার পরে ক্রমশঃই তাহা পশ্চাতে পড়িয়া যাইতে থাকে। বেদান্তের যুগ হইতে 'ত্যাগেরই' মাহাত্ম্য প্রচার হইয়া আসিতেছে। তদবধি আমাদের দেশের স্যাঁৎসেঁতে মাটিতে ও ভিজা আব্‌হাওয়ায় 'খাওয়াপরা জানেনা' এমন দেবতার মত মানুষ জন্মিয়া থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু 'মানুষের মত মানুষ' বুঝি জন্মে নাই! না বুঝিয়া কথা বলিতে, অর্থ-শূন্য শব্দের আড়ম্বর করিতে, স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে, এমন বুঝি কোনও দেশের লোক জানেও নাই, পারেও নাই।

সংসারের লোক তুমি; দুঃখে কষ্টে ঝালাপালা হইয়া কি যে তোমার 'প্রাণ' চায় তাহা বুঝিতে পারিতেছ না; 'মুখে' ফাঁকা সুখ, শান্তি, কি আনন্দের আকাঙ্ক্ষা করিতেছ। অন্তরে কিন্তু কেবলই অবিশ্বাস, কেবলই নৈরাশ্য, কেবলই দুঃখের চিন্তা, অশান্তির ভাব! শুনিলে 'ওঃ, অমুক স্থানের

অমুক 'মহাপুরুষ' সাক্ষাৎ শিব!'—জাতিগত একটা সংস্কার রহিয়াছে, অমনি দৌড়াইলে তাঁর কাছে। মনে কত আশা, তাঁর একটা কৃপা কটাক্ষে, একটা অমৃতময় কথায়, তোমার মনে সুখ, শান্তি, আনন্দের উদ্দাম ফোঁয়াড়া ছুটিয়া যাইবে! কোথায় রহিবে দুঃখদারিদ্র্য, শোকতাপ!

তুমি ত' ছুটিয়া ছুটিয়া কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া মহাপুরুষের চরণতলে আসিয়া লুটাইয়া পড়িলে! তিনি অমনি বালকের মত সরল হইয়া অথবা রুদ্র সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন "বাপুহে, চলেছ ভোগের পথে, ও সব পাবে কোথায়? সুখ যদি চাও, শান্তি যদি চাও, আনন্দ যদি চাও—এসো 'ত্যাগের' পথে, সব ছেড়ে এসে 'তাঁকে' ধর। দেখ্‌বে, সুখ শান্তি আনন্দের অবধি নাই। কর, ত্যাগ অভ্যাস কর, তবেই সব হবে!"

এমন ভয়ানক মিথ্যা কথা বলিয়া কি বাপু লোক ঠকাইতে হয়? না, আত্ম প্রতারণা করিতে হয়? নিজে যদি সন্ধান না পাইয়া থাক, সে কথাটা খুলিয়া বলিতে আপত্তি কেন?

"নেতি নেতি," "ত্যাগ ত্যাগ" করিয়াই সমগ্র ভারতটা অধঃ-পতনের রসাতলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তুমি নিজেও যে কতটা উপরে উঠিয়াছ, কতটা সুখ শান্তি আনন্দের সন্ধান পাইয়াছ, তাহা ত' তোমার দৈহিক ভোগে, বাক্যের অসার্থ-কতায়, রোগের যাতনায় এবং অকাল মৃত্যুতে আর মৃত্যুর সময়কার ব্যবহারেই প্রমাণিত! তবু আবার তুমি ত্যাগের

কথা মুখে আনিতেছ! মঙ্গলময় ভগবানের যে যত নিকটবর্ত্তী হইবে, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া মঙ্গলময় বিভূতিগুলি আপনা হইতে ততই প্রকাশ পাইতে থাকিবে। 'সিদ্ধাই' বলিয়া তাহা উড়াইতে গেলে চলিবে কেন?

ত্যাগ করিবে কি হে বাপু? তোমার আছে কি যে ত্যাগ করিবে? রাস্তার ভিখারী হইয়া বলিতেছ, বেঙ্গল ব্যাঙ্কের টাকায় আমার প্রয়োজন নাই—আমি উহা ছাড়িয়া দিলাম! মাথা রাখিবার কুটীর খানা নাই—অথচ ভড়ং করিতেছ, যেন গৌতম বুদ্ধেরই মত রাজসিংহাসন ত্যাগ করিতেছ! ধিক্ তোমাকে, আর দুরদৃষ্ট তা'দের, য'ারা তোমার কথাটা বেদবাক্য মনে ক'রে মিথ্যার পাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!

য'ার নিজের চুলগাছিও নিজের নয়, একটা নিঃশ্বাসে যা'র 'ভবের খেলা সাঙ্গ' হ'য়ে যায়, তা'র আছেই বা কি, সে ত্যাগই বা করিবে কি? একবার এ কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? 'অধিকারী' হইলে, তবে 'ত্যাগ' করা চলে। 'আঃ, আঙ্গুরগুলো কি টক্! এদের কে খায়'! একথা বলিয়া শেয়ালের মত 'ত্যাগ' করার মূল্য কি?

আগে 'নিজস্ব'টা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লও; কি তোমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া উচিত তাহা আগে জানিয়া ও পাইয়া লও—আগে নিজেকে ও নিজস্বকে ওজন করিতে শিখ; তার পরে 'ত্যাগ' করিব বা 'বিলাইয়া' দিব,' যাহা বল, তাহাই সাজিবে। 'ছোটমুখে বড়কথা' শুনিয়া ভগবান্‌ও

হাসি রাখিতে পারেন না। প্রকৃতিস্থ লোকে অর্থশূন্য কথা বলিলে, তাহার সম্বন্ধেও লোকে বলিয়া থাকে—লোকটা ক্ষেপেছে হে!

তুমি কিংবা তোমার উকীল হয় ত' বলিবে—কাম ক্রোধ লোভ মোহ,—এসব 'ত্যাগ' করিতে বলা হইয়াছে।—বেশ কথা বাপু! কামটা তোমার, না, তুমি কামের? তোমার যদি কাম হইবে, তবেত' সে তোমার ইচ্ছায়ই, তোমার আদেশ, নির্দ্দেশেই কার্য্য করিত? বুকে হাত দিয়া বলত'—তা কি সে কখনও করে? না, তা'র ইচ্ছায়ই তুমি উঠিয়া বসিয়া থাক? তবে আর ত্যাগের কথা কেমন করিয়া মুখে আনিবে? ক্রীতদাস মুনিবকে ছাড়িয়া যাইতে পারে কি? ইচ্ছা করিলে মুনিব তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারেন। কাম তোমাকে ত্যাগ করিতে পারে; তোমার সাধ্য নাই যে তুমি কখনও তাহাকে ত্যাগ করিবে। মনে পড়ে না কি সেই বড় দুঃখের কাতর চীৎকার—হাম্ তো কম্‌লীকো ছোড়্ দিয়া লেকেন্ কম্‌লী তো ছোড়্‌তা নেই!"

ঐ যে শুনিতে পাইতেছি—আবার তোমরা বলিতেছ, ওহে কাম ক্রোধ ত' ত্যাগ করার কথা হচ্ছে না। যারা এদের প্রকাশের পথ ও লীলার ক্ষেত্র, সেই ইন্দ্রিয়-গুলিকে যারা পুষ্ট ও সতেজ করে সেই 'বিষয়গুলি' ত্যাগ ক'র্‌তে বল্‌চি। তবেই ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হ'বে এবং কাম ব্যাটারা দমন হ'বে।

বেশ কথা। বিষয়গুলিই কি তোমার? তা'দের উপর তোমার কোনও আদেশ নির্দ্দেশ খাটে কি? তা'দের তুমি ত্যাগ করিবে কিহে? তারা যে জোর করিয়া কাণে ধরিয়া তোমাকে যখন তখন আসিয়া বলিবে—'ওরে কাণা, একবার চোখের মাথা খেয়ে আমার রূপের ডালিটা দেখ্ না! ওরে কালা, একবার আমার মলের রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু শোন্ দেখি। ওরে জড়্, একবার আমার অঞ্চল বীজনে কত সুখ, তা অনুভব কর্ দেখি!—তখন তুমি থাকিবে কোথায়? মহেশ্বরের ধ্যান ভঙ্গ, শকুন্তলার জন্ম, পুত্র শোকে পরমজ্ঞানী বশিষ্ঠের জলে ঝাঁপ—এসকলই 'ত্যাগে'র নিষ্ফলতার জ্বলন্ত চিত্র।

কাল অনন্ত। দশ হাজার, বিশ হাজার কি বিশ কোটি বৎসরই না হয় তুমি 'সমাধিস্থ' হইয়া 'সুখ দুঃখের অতীত' হইয়া রহিলে। তারপর?—ভগবানের যে দুই বিভিন্ন বিপরীত শক্তির খেলায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব, তাহার প্রভাব, তুমি চক্ষু বুজিয়া থাকিলেও, তোমার উপর সমান ভাবেই চলিতেছে, চলিতে থাকিবে। চক্ষু বুজিয়া থাকিতে যাইয়া এই উভয় শক্তির প্রভাবের অতীত একটা অবস্থা তুমি কল্পনা করিয়া লইয়াছ; ইহাদের একটিকেও তুমি ধরিয়া থাক নাই—'অনন্যচিত্ত হইয়া আকর্ষণ কর নাই'। কাজেই তখন উভয়টিই তোমার উপর সমান ভাবে ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে। কখনও তোমার বাক্য সত্য হয়, কখনও হয় না; কখনও চিত্ত স্থির হয়, কখনও হয় না; কখনও দুঃখে চীৎকার কর, কখনও কর না। এই ভাবে

ক্রমশঃ মরণের পথে চলিতে চলিতে, ভগবান্ অনন্ত হইলেও, তোমার অন্ত হইয়া থাকে!

তাই বলি, অর্থহীন কথা বলিয়া দেশটাকে ও মানুষগুলাকে আর গোল্লায় দিওনা। মানুষের মত মানুষ যদি তৈয়ার করিতে না পার, 'দেবতার মত মানুষ' আর গড়িতে যাইওনা।

ত্যাগও নয়, দমনও নয়। যার উপর তোমার কোনই আধিপত্য নাই, তার সম্বন্ধে এ দু'কথাই অর্থহীন।—তবে কি হাল ছেড়ে দিতে হ'বে? না, কখনই নয়। 'মোড়' ফিরিয়ে দিতে হবে। এই বিরাট্ বিশ্ব তার মালিকের বিপরীত গুণের অনন্ত, অফুরন্ত ভাণ্ডার। সেই মালিকের অতুল রূপের ছটামাত্র পেয়েই আমার প্রেয়সীর রূপ আমায় পাগল ক'রে তুলেছে! তাঁর অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র পেয়েই বসুন্ধরার গর্ভে মণিমাণিক্য রজতকাঞ্চন ধরে না! রূপের পিপাসা আমার মিটে না?—তা মিট্‌বে কেন? অনন্ত রূপ-সুধা পান কর্‌বার অধিকারী হ'য়ে আমি যে ক্ষণভঙ্গুর কণিকা নিয়ে প'ড়ে রয়েছি! তাইত' আমাকে কণিকা হ'তে কণিকায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, কিন্তু শান্তি নাই! কণিকা ধ'রেই রূপ সাগরের দিকে ছুট্‌তে হ'বে। সাগরে পৌঁছালে, তবে ত' পিপাসা মিট্‌বে। রূপ ত্যাগ ক'র্‌বোনা, লালসা দমন ক'র্‌বোনা, রূপের ভাণ্ডারের দিকে ছুট্‌বো। সে ভাণ্ডার জীবন্ত ক'রে তুল্‌বো, তন্ময় হ'য়ে তাঁকে দেখ্‌বো, ভোগ কর্‌বো! তবেই শান্তি, তবেই সুখ এবং তখনই আনন্দ।

অর্থ চাই আমি ?—চাইবোই ত'। এত মণিমাণিক্য যে আমারইজন্য ! কিন্তু দু'দশ টাকা কি দু'দশ কোটি উভয়ই সমান তুচ্ছ, সীমাবদ্ধ—আজ আছে কাল নাই; ব্যয়ে ব্যয়ে ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কিন্তুআসল ভাণ্ডারটি অনন্ত—আমারই জন্য। দু'দশ টাকা খুঁজ্‌তে যেয়ে ভাণ্ডারের পথ হারিয়ে ফেলেছি। তাই টাকা টাকা করে গলদঘর্ম্ম হ'য়েও আশা আর মিটে না, প্রাণে যে অনন্ত পিপাসা ! কড়া ক্রান্তি কুড়াতে না যেয়ে এখন ভাণ্ডারের পথ খুঁজ্‌বো—তখন পায়ের নীচে ঐশ্বর্য্য গড়াগড়ি খাবে। সুধু মুখে চাইলে হ'বে না। যা'র দিবার শক্তি নাই, তা'র কাছে চাইলেও হবে না। চাইতে হ'বে প্রাণের সঙ্গে, চাইতে হবে তাঁর কাছে, যাঁর দিবার শক্তি আছে। তাঁ'কে ভাণ্ডারী ক'রে রাখ্‌তে হ'বে—ইসারায় তিনি ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার নিয়ে এসে হাজির হ'বেন এমনটি ক'রতে হ'বে। অর্থের জন্য আর ব্যাকুল হ'তে হ'বে না। যখন যে পরিমাণ আবশ্যক, আপনা হ'তেই সেই পরিমাণ এসে উপস্থিত হ'বে। ভগবানের ভাণ্ডারটি হ'বে তোমার গচ্ছিত অর্থের ভাণ্ডার বেঙ্গল ব্যাঙ্কের মত; আবশ্যক মত চেক্ কাট্‌বে আর টাকা আস্‌বে। এইরূপে, সুধু অর্থ নয়, যখন যে বিষয়ের প্রয়োজন হ'বে, তা আপনা হ'তেই সিদ্ধ হ'বে। বাক্য সত্য হ'বে, আশীষ অমোঘ হ'বে, দেহ সুস্থ, জীবন দীর্ঘ, এমন কি মৃত্যুও বশ্য হ'বে।

এ সব যদি না পার—তোমার সাধনা ও জন্ম উভয়ই বৃথা।

ত্যাগের কথা স্নধুই কাপুরুষের কপট মহত্ত্ব, জগদীশ্বরের নামে কলঙ্ক আরোপ !

এই বিরাট্ বিশ্ব-ভাণ্ডারে এমন কোন জিনিষের সন্ধান কখনও পেয়েছ কি, যাহা ভগবানের বাহিরে, যাহা আপনার শক্তিতে শক্তিমান, আপনার অস্তিত্বে অস্তিত্ববান্ ? তা যদি না পেয়ে থাক, তবে অনন্ত শক্তিমানের, অপরিমেয় ইচ্ছা-ময়ের কোন্ সৃষ্টিটা তুমি ত্যাগ করিতে পার ?

যেটা নিতান্ত তোমার 'নিজস্ব'—তোমার প্রাণটা, সেটাও কি তুমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে পার ? গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিয়া দেখিয়াছ, কতবার দড়ি ছিঁড়িয়া গিয়াছে ; বিষ খাইয়া দেখিয়াছ, কতবার ক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বিষ উঠাইয়া ফেলা হইয়াছে ; জলে ডুবিয়া দেখিয়াছ, কতবার ভাসিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছ, মরণ আর হয় নাই ! আবার যখন প্রাণটার উপর বড়ই মমতা হয়, কিছুতেই এ দেহটা ছাড়িয়া, এ ঘর বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না, তখনইত' কোথা হইতে কে আসিয়া প্রাণটা চুরি করিয়া লইয়া যায় !

তথাপি, তুমি ত্যাগ করিবে !

তাই বলি, বাপু, ত্যাগের কথা আর মুখেও আনিওনা। বল, গ্রহণের কথা ; বল, আকর্ষণ করার কথা। ভগবানের অংশ আমি, তাঁহা হইতে অভেদ আমি, তাঁহার সকলই আমার। আমি 'ইহা' গ্রহণ করিব—'ইহা' আমি চাই এবং আকর্ষণ করিয়া আমার নিজস্ব করিয়া লইব,—পার যদি এই কথা বল।

ভগবানের এক মাথা কি সহস্র মাথা, অথবা মাথা আছে কি নাই—তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। এই বিরাট্ বিশ্ব-ভাণ্ডার—ইহার দিকে চাহিলে তাঁহার যে পরিচয় পাওয়া যায় বর্ত্তমানে তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

এই বিশ্ব-ভাণ্ডারে ভগবানের বিপরীত গুণের সমাবেশ দেখিতে পাই—উভয়ই অসীম, অপরিমেয়। হাসিরও অন্ত নাই, কান্নারও শেষ নাই; সুখেরও পার নাই, দুঃখেরও অবধি নাই। তিনি অনন্ত অমৃতের ভাণ্ডার, আবার অনন্ত গরলেরও ভাণ্ডার।

বিশ্ব-নিয়ন্তা নিতান্ত অপক্ষপাত। তিনি জ্ঞান অজ্ঞান,-সুখ দুঃখ, ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য, প্রেম দ্বেষ—এ সকল কিছুই হাতে ধরিয়া বিতরণ করেন না। আমরা যে যাহার রুচি প্রবৃত্তি এবং তদনুরূপ কার্য্যদ্বারা তাঁর অনন্ত ভাণ্ডার হ'তে অমৃত বা বিষ 'টানিয়া' লই।

তাঁর ভাণ্ডারটাই, অর্থাৎ তিনি নিজেই বিপরীত গুণের সমাবেশ। কিন্তু তথাপি আলো যেখানে, সেখানে অন্ধকার নাই; জীবন যেখানে, সেখানে মৃত্যু নাই; সুখ যেখানে, সেখানে দুঃখ নাই। উভয়ই যে অনন্ত, অতল ও অসীম। বিশ্ব-ভাণ্ডারে তার মালিকের যে পরিচয় মিলে, সে দিকে তাকাইয়া দেখনা, তাই অজ্ঞানে ডুবিয়া রহিয়াছ—তাই দিনের পরে রাত্রি দেখিয়া থাক; দিনের আলো এবং তাপ উপভোগ করিতে করিতেও অনাগত রাত্রির আঁধার ও জড়তার ভয়ে

কাতর হইয়া থাক ! কিন্তু এটা কি সত্য ?—কখনই নয়। মায়ায়—অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলিয়া মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছ। দিন অফুরন্ত—রাত্রিও অফুরন্ত। চঞ্চল বলিয়া, ধরিয়া থাকিতে পারনা বলিয়া, দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন ভোগ করিতেছ। একই সূর্য্য একই স্থানে থাকিয়া সমান ভাবে আলোক ও উত্তাপ বিতরণ করিতেছে ; পৃথিবীটা সরিতেছে বলিয়াই ত' এশিয়ার সূর্য্য আমেরিকায় দিন করিতেছে। কিন্তু সূর্য্যের দিন করার বিশ্রাম নাই। চঞ্চল পৃথিবীকে আশ্রয় না করিয়া যদি অচঞ্চল সূর্য্যকে ধরিয়া থাকিতে পারিতে, তবে দিন ছাড়া রাত্রি যে কখনও আছে তাহা কি তুমি জানিতে পাইতে, না, রাত্রির ঘনান্ধকার নিবারণের জন্য, অন্ধকারের গণ্ডী 'ত্যাগ' করিবার জন্য, ক্ষীণশক্তি দীপের সাহায্য লইতে যাইতে ? এই চঞ্চল পৃথিবীর উপরেই চাহিয়া দেখ। নরওয়ে দেশের লোকের ত', রাত্রি বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার সঙ্গে একরূপ পরিচয়ই নাই বলিলেও চলে ; সে দেশের লোক যে 'নিশীথ ভাস্কর'ও উপভোগ করিয়া থাকে !

তাই বলিতেছি, ত্যাগের তোমার কোনই প্রয়োজন নাই। কেবল, কি তুমি বাস্তবিক চাও, তাহাই জানিয়া লওয়া এবং তাহাই ধরিয়া থাকা, আর সেই পদার্থের যে অনন্ত ভাণ্ডার, তাঁহার সঙ্গে তোমার সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখা—ইহাই হইল তোমার কার্য্য। যাহা তুমি ত্যাগ করিতে চাও, সেটাই তোমার মস্তিষ্ক এবং চিত্ত উভয়ই জুড়িয়া বসিয়া থাকে; তাহারই চিন্তায়

তুমি আকুল, তাহারই ভাবে তুমি তন্ময়। কাজেই, 'ত্যাগ' করিতে যাইয়া 'ত্যজ্য' বস্তুটাকেই তুমি অজ্ঞাতসারে বরণ করিয়া লইতেছ —আকর্ষণ করিতেছ! 'দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি' করিতে যাইয়া, 'কামিনী কাঞ্চন' ত্যাগ করিতে বসিয়া, 'দুঃখটাকেই,' 'কামিনী-কাঞ্চনটাকেই' তুমি ধ্যায় বস্তু করিয়া তুলিয়াছ! আশা ও আকাঙ্ক্ষার অপেক্ষা ভয়, উদ্বেগ ও সন্দেহের শক্তি সাধারণ জীবনে অনেক বেশী। ভয়ে যতটা একাগ্রতা জন্মে, 'ভয়ানক' জিনিষটার দিকে মনটা যত সহজে আকৃষ্ট হয়, আশায় কখনও ততটা একাগ্রতা জন্মেনা কিংবা 'আশাপ্রদ' বস্তুটাও কখনও তত সহজে মনটা আকর্ষণ করিতে পারেনা। আশার সঙ্গে সঙ্গে যে আশঙ্কার উদয় হয়, তাহার প্রভাবই বেশী, না, আশঙ্কার ঘন মেঘের উপর যে আশার বিদ্যুৎ ঝলক দিয়া ওঠে তাহারই প্রভাব বেশী, তাহা তুমি নিজেই ভাবিয়া দেখিও।

ত্যাগ করিবার ইচ্ছার মূলে দুঃখের স্মৃতি। সেই স্মৃতি হইতেই বিরক্তি ও ভয়ের উদ্ভব। সকলেই জান, সুখের স্মৃতি অপেক্ষা দুঃখের স্মৃতির প্রভাব কত বেশী। দুঃখের সাগরে ডুবিবার সময় অতীত সুখের কথা মনে হইলে হো হো করিয়া হাস, না আরও দুঃখে ডুবিয়া যাও? আর, সুখের সাগরে ভাসিয়াও অতীত দুঃখের কথা মনে হইলে, সুখটাই বেশী গভীর হইয়া ওঠে, না, ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কাই বেশী জাগিয়া ওঠে ও বর্ত্তমানের উপর অতীতটা ভাসিয়া উঠিয়া চোখের জলে বুক ভিজাইয়া দেয়?

তাই বলিতেছি বাপু, যার অস্তিত্বের মূলে দুঃখের স্মৃতি; ভয়, উদ্বেগ আশঙ্কা ও বিরক্তিতে যার দেহ গঠিত—সেই 'ত্যাগের' কথাটা আর শুনাইও না। অর্জ্জন করিতে থাক, বর্জ্জন আপনা হইতেই হইতে থাকিবে।

শুনাবে যদি, শুনাও—গ্রহণের কথা, আকর্ষণের কথা। বল, ভগবানের অনন্ত অমৃত ভাণ্ডার হ'তে অমৃত—জ্ঞান, মঙ্গল, ঐশ্বর্য্য, সচ্ছলতা, সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, বিশ্বাস, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, শক্তি, সাহস, সিদ্ধি ও জীবন, অর্থাৎ মঙ্গলের পূর্ণতা—গ্রহণ করিতে, আকর্ষণ করিতে। শুনাও সেই অমৃতময় সত্য—"অনন্যচিন্তয়ন্তো যে জনাঃ মাং পর্য্যুপাসতে, তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং"। জলদগম্ভীর স্বরে জানাইয়া দাও, মঙ্গলময় নিজমুখে বলিয়াছেন, যে আমাকে বই জানেনা, সর্ব্বদা আমারই চিন্তা করে, তাহার সেই চিন্তার, আকর্ষণের, জোরে অনন্ত মঙ্গল তার বাড়ীতে আমি মাথায় করিয়া পৌঁছাইয়া থাকি।

মাটির মানুষ হইতে আর কখনও বলিওনা। অহঙ্কার ত্যাগ করিতে শিখাইয়া ভগবানের সৃষ্ট, ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত, সঞ্জীবিত, পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত মানুষকে আর দুঃখের পথে পাঠাইও না—জীবন্মৃত করিয়া রাখিও না। যে গীতার এত বড়াই কর, সেই গীতায় অহঙ্কারের যে বিকাশ, তাহা অন্য কোথাও দেখিয়াছ কি? ভগবান্ তোমাকে কি বলিয়াছেন, কি শিখাইয়াছেন?—বলিয়াছেন, বিশ্বাস করিতে আহ্বান

করিয়াছেন,—যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা আদর্শ, তাহাই আমি। আর, তুমি কি শুনাইতেছ?—তুমি শুনাইতেছ—মান, অভিমান সব ত্যাগ ক'রে মাটির মানুষ হও!

যিনি পূর্ণ জ্ঞান, অনন্ত বিজ্ঞান, অপরিমেয় শক্তি, তাঁহারই অংশ, তাঁহা হইতে অভিন্ন, তাঁহারই জীবনে জীবিত, তাঁহারই তেজে উদ্ভাসিত জীবের চক্ষুর সম্মুখে আর তুমি জীবন্মৃতের চিত্র ফুটাইয়া তুলিও না। তার প্রাণে অহঙ্কার জাগাইয়া দাও—বলিয়া দাও তাকে, সে কে, কত বড়; আপনার মূলটা আঁকড়িয়া ধরিলেই, হা হুতাশ, বিলাপ পরিতাপ, আশঙ্কা উদ্বেগ, সন্দেহ ভয় পদদলিত করিয়া, পরের দিকে না চাহিয়া আপনার ভিতরের দিকে চাহিলেই, সে যে বিরাট্, সে যে মহান্, সে যে মঙ্গলঘন হইয়া বসিতে পারে!

কেহই কাহাকে কিছু আনিয়া দেয় না—আকর্ষণের শক্তি ও আকৃষ্ট বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে অল্প কি অধিক পরিমাণে সুখ দুঃখ ইত্যাদি পাইয়া থাক। চক্ষু মেলিয়া দেখ, সমস্তটা বিশ্ব জুড়িয়াই আকর্ষণ-শক্তির খেলা চলিতেছে। এই আকর্ষণ-প্রভাবেই গ্রহ নক্ষত্র অনন্ত শূন্যে ঝুলিয়া রহিয়াছে। আকর্ষণেই পূর্ণতা সাধন, আবার আকর্ষণেই অপচয় ঘটিয়া থাকে। যতক্ষণ পূর্ব্ব আকর্ষণের ফলে তোমার অর্থ থাকে এবং তুমি অর্থ আকর্ষণ করিতে থাক, ততক্ষণ তোমার অর্থাৎ সেই অর্থবান্ তোমার এমনি একটা আকর্ষণী শক্তি বিকশিত হয় যে আত্মীয় অনাত্মীয় বন্ধু লোক আপনা হইতেই আসিয়া তোমাকে পুষ্ট করিয়া তোলে।

আবার যখন সেই অর্থের অভাব উপস্থিত হয়, অর্থ আকর্ষণ করিতে ভুলিয়া যাইয়া তুমি দারিদ্র্য আকর্ষণ করিতে থাক, তখন অর্থের সঙ্গে সঙ্গে একে একে সকলেই দূরে সরিয়া পড়ে, তুমি ক্রমেই আপনাকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর অনুভব করিতে থাক। স্থূলদৃষ্টির নিকট সকল সময় প্রতিভাত না হইলেও, সূক্ষ্ম বিচারের নিকট সর্ব্বদাই প্রতিপন্ন হইবে যে, জীবন ও মৃত্যু এই আকর্ষণেরই ফল।

অহঙ্কার দমন করিতে না বলিয়া, জানাইয়া দাও মানুষকে, তা'র আকর্ষণের কি অসীম প্রভাব। আকর্ষণ করিতে পারিলে, অসীমানন্ত ভগবান্‌কেও সে তা'র আকৃষ্ট গুণের সমবায়ে গঠিত করিয়া আপনার সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারে— আপনার অভিলষিত বিষয় তাঁহাকে দিয়া বাস্তব সত্যে পরিণত করাইয়া তুলিতে পারে!

আশা আকাঙ্ক্ষার মত আশঙ্কা নৈরাশ্যের, বিশ্বাস ও সাহসের মত সন্দেহ উদ্বেগ এবং ভয়ের ও আকর্ষণী শক্তি আছে। এবং ইহাদের পরিমাণ অনুসারে সেই শক্তিরও পরিমাণ বিকশিত হইয়া থাকে। এই শক্তি যত বিকশিত ও পুষ্ট হইবে, ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডারের উপর ততই জোরে টান পড়িবে, এবং সেই ভাণ্ডার হইতে ততই বেগে ও ততই পরিমাণে আকাঙ্ক্ষিত কিংবা উদ্বেগজনক ও পরিত্যজ্য বস্তু তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবে। যেখানে সন্দেহ নাই, অবিশ্বাস নাই, উদ্বেগ নাই সেখানে অভিলষিতের প্রাপ্তিতে সিদ্ধি;

আর যেখানে সন্দেহ, আশঙ্কা, অবিশ্বাস, সেখানে যাহা চাওনা, যাহা ভয় কর, তাহারই প্রাপ্তিতে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

তাই বলি, দুঃখে কষ্টে, শোকে জর্জ্জরিত হইয়া যে সংসারী জীব তোমার নিকট শান্তি খুঁজিতে যায়, ত্যাগের কথা বলিয়া, ত্যাগের পথে চালাইয়া, তাহাকে গভীরতর দুঃখ কষ্ট আকর্ষণ করিতে শিখাইও না। সুখ দুঃখের অতীত যে কাল্পনিক অবস্থা, সেই অবস্থা লাভ করিবার জন্য তাহাকে ডাকিয়া লইওনা। দুঃখের দ্বারা সীমাবদ্ধ সুখের দিকে তোমার দৃষ্টি, তাই তুমি মনে কর—এ সুখ কিছুই নয়, এ সুখ হেয়। অসীমানন্ত সুখের কথা মনে করিয়া দেখ। দুঃখের সেখানে লেশ নাই; সে সুখ 'দ্বন্দ্বাতীত' নয়—দ্বন্দ্বরহিত। সে সুখ অতি উচ্চ, অতি পবিত্র। সুখদুঃখের অতীত তোমার কল্পিত সুখ—আনন্দ—খুঁজিতে যাইয়া, ভগবানের ভাণ্ডার হইতে তুমি সুখ দুঃখ কিছুই আকর্ষণ করিতেছ না, অতএব উভয়ই তোমার লাভ হইবে। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, তোমার অজ্ঞাতসারেও দুঃখটাকেই কিছুনা কিছু আকর্ষণ করিয়া থাক! কারণ দুঃখের ভয়েই তুমি এই 'সুখ দুঃখের অতীত' অবস্থা লাভের চেষ্টা করিতেছ! কাজেই সুখ অপেক্ষা দুঃখই তোমার অধিক লাভ হইবে! তুমি বলিবে—ইহা দেহের ভোগ। অনেক সময় ইহা তোমার অন্তরাত্মা স্পর্শ না করিলেও কোনও সময়ে না কোনও সময়ে ইহা যে তোমার অন্তরাত্মায় আঘাত করে, মহেশ্বরের ধ্যান ভঙ্গে ও বশিষ্ঠের জলে ঝাঁপে তাহা প্রমাণিত। অতএব এই

অসার্থক পথে আর তাহাকে পাঠাইওনা। পার যদি, তাহাকে তাহার জীবনের মূল সূত্র দেখাইয়া দিও, সবলে সেই সূত্র ধরিয়া সুখ শান্তি আনন্দ আকর্ষণ করিতে বলিও। ঐকান্তিক ইচ্ছা করিলে সে যে ভগবানের মঙ্গলময় বিভূতিগুলির মালিক হইয়া বসিতে পারে,—দুঃখ দৈন্য শোকতাপ,আধিব্যাধি ও মৃত্যুর হাত এড়াইয়া নিজে চিরমঙ্গলময় হইয়া বসিতে পারে, তাহাই শুনাইয়া তাহার অহঙ্কার জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিও।

বুঝিয়াছি, তুমি কি বলিবে। উহা বলিয়া এবং উহাতে বিশ্বাস জন্মাইয়াই দেশটাকে উৎসন্নের পথে পাঠাইয়াছ। তুমি বলিবে—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'; সুখ শান্তি আনন্দ ঐশ্বর্য্য, এ সকলই মিশ্র, সীমাবদ্ধ ও অস্থায়ী; অতএব ইহাদের দিকে লক্ষ্য করিলে কেবল দুঃখই লাভ হইবে। সত্য হইতে যাহার উদ্ভব, সত্যে যাহার স্থিতি, তাহা কখনই মিথ্যা হইতে পারেনা। অজ্ঞান বশতঃ আমরা অস্থায়ী বলিয়া বোধ করি, মিথ্যা বলিয়া থাকি, এবং কার্য্যতঃও অস্থায়ী এবং মিথ্যা করিয়া থাকি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দিন রাত্রি, সুখ দুঃখ, সকলই অনন্ত—অফুরন্ত। পৃথিবী, ছাড়িয়া যে সূর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারে, সে রাত্রি বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা জানিতে পারে কি? সুখের, শান্তির, ঐশ্বর্য্যের, জীবনের যিনি-মূল—অনন্ত অপরিমেয় ভাণ্ডার, তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, তাঁহার সঙ্গে বিচ্ছেদ-রহিত যোগ সাধন করিতে পারিলে, কখনও সুখৈশ্বর্য্যের লাঘব কিংবা মৃত্যু

ঘটিতে পারেনা। মায়ার প্রভাবে তোমার এখনকার সুখের পাশাপাশি দুঃখের চিত্র ফুটিয়া রহিয়াছে। তাই, এখনকার সুখটা অসার ও হেয়। কিন্তু এই সুখ ধরিয়াই তখন যে সুখ হইবে, দুঃখ তাহার পিছনে পড়িয়া থাকিবে,—'দ্বন্দ্বরহিত' নির্ম্মল সুখের তুমি অধিকারী হইবে। তোমার সঙ্গে কথা বলিবার সময় তোমার পিছনের দিক্ আছে না আছে তাহা যেমন আমার লক্ষ্যই হয় না, তেমন সেই সুখের সময়ও দুঃখ কখনও তোমার মনে আসিবেনা। ইহা অবিমিশ্র, অনন্ত, অতএব পরম ও পূর্ণ। অবিশ্রান্ত সেই অনন্ত ভাণ্ডার হইতে এই সুখ আকর্ষণ করিতে থাকিলে, দুঃখ ও মৃত্যু আসিবে কেমন করিয়া ?

অন্ততঃ মৃত্যুর কথা শুনিয়া যে তুমি হাসিতেছ—বলিতেছ, এপর্য্যন্ত কেহ মৃত্যুর হাত এড়াইয়াছে কি ?—তাহা আমি বেশ শুনিতে পাইতেছি।

ঠিক বলিয়াছ—'অমর' মানুষ এ পর্য্যন্ত আমাদের চোখে পড়ে নাই। কিন্তু সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছেন, তোমাদের সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে এমন লোক একেবারে বিরল নহেন। জানিনা তাঁহারা স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন কিনা। তবে এ কথা নিঃসন্দেহ যে, মৃত্যুর অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিলে, মৃত্যুর আশঙ্কা ও ভয় হৃদয়ে স্থান না পাইলে কখনও মরণ হইতে পারেনা। চতুর্দ্দিকেই মৃত্যুর খেলা—ইহা দেখিয়া মৃত্যুর ভয়টা আপনা হইতেই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। তার উপর আবার নিজের জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার ও জাতিগত সংস্কার রহিয়াছে। কাজেই,

ঠিক 'ভয়' বলিয়া অনুভূত না হইলেও, মৃত্যু যে ধ্রুব, এই বিশ্বাস আমাদের অস্থিমজ্জার মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট। সেই বিশ্বাসই, যে মৃত্যু ভয় করেনা, তাহারও মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কিছুই আকর্ষণ করে না, তাহার বিপরীত দুইটি অবস্থাই স্বভাবতঃ ও প্রাক্তনের ফলে লাভ হইয়া থাকে। যে স্বাস্থ্য ও জীবন আকর্ষণ করে না, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু তাহার আপনা হইতেই আসিবে। স্তধু মৃত্যুকে ভয় না করিলেই বাঁচিয়া থাকা যায় না—মরণের বিপরীত 'জীবন' আকর্ষণ করিতে হইবে। তবেই মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়।

যতদিন পর্য্যন্ত মৃত্যু সম্বন্ধে সন্তানের মনে কোনও ধারণা, এবং ভয় কিংবা বিশ্বাস স্থান পায়না, তত দিন তাহার মৃত্যু হইতে পারেনা। তবে এত অসংখ্য শিশু মরে কেন ?—মরে এই জন্য, সে তখন তাহার নিজের নয়, তাহার পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের। তাহার নিজের বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিছুই নাই, প্রাক্তন সংস্কারও এখনও জাগিয়া ওঠে নাই। পিতামাতা প্রভৃতির প্রাক্তন কর্ম্ম এবং সন্দেহ, উদ্বেগ, আশঙ্কাই মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার শিয়রে উপস্থিত করে। 'এই বুঝি গেল' ! "নাঃ, এ যাত্রায় আর রক্ষা, নাই" !—পিতামাতার এই দীর্ঘ নিঃশ্বাসই তাহার মরণের প্রধান কারণ।

সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীটা গাঁজাখোরের কল্পনা নয়। সাবিত্রীর প্রাণে অদম্য বিশ্বাস ছিল, তিনি বিধবা হইবেন না। তাই মরিয়াও তাঁহার স্বামীকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।

যে পিতার প্রাণে অটল বিশ্বাস—আমার এই সন্তানগুলি লইয়া আমি ; ইহাদের একটিরও অভাব হইলে আমার 'আমিত্ব' হ্রাস প্রাপ্ত হয়,—তাহার প্রাণে যদি মৃত্যুর আশঙ্কা স্থান না পায়, তিনি যদি বিশ্বাস করেন যে 'আমি' মরিব না, তবে তিনি নিজে'ত মরেনই না, তাঁহার সন্তানও মরেনা। যত দিন পর্য্যন্ত তাহার আমিত্বের গণ্ডী খর্ব্ব হইয়া সুধু তাহার দেহটিকে আশ্রয় না করিবে, ততদিন কিছুতেই তাহাদের মৃত্যু নাই।

দ্বিতীয়—নাম ও মন্ত্রের কথা ; মোক্ষ

সর্ব্বনাম প্রয়োগে তুমি নিজের ও পরের চোখে কি ধূলাটাই দিচ্ছ! "তাঁকে" ধরে থাক, "তাঁর" নাম কর,—দেখবে, কি সুখ, কি শান্তি, কি আনন্দ!—এই কথাটা বলিয়া জিজ্ঞাসু আর্ত্তের প্রাণে গভীরতর নৈরাশ্য জাগাইয়া তুলিতে তোমার এতটুকুও কুণ্ঠা হয় না! তোমার "তাঁকে"র যে কি মানে, তা তুমি নিজেই বোঝনা ; যাকে ধরিয়া থাকিতে বল, সে হা করিয়া ভাবিতে থাকে, 'ওগো এই তাঁকে টা কে? যাঁর কিছুই বুঝিনা, তাঁকে আবার ধরিব কেমন করিয়া?'

তখন তুমি নাম করণে ব্রতী হও ; ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ, দুর্গা, কালী, বাবা, মা—নামের পর নাম করিয়া যাইতে থাক। কিন্তু পদার্থের সঙ্গে সংযোগ না থকিলে, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি গুণের সমষ্টিভূত একটা ঘন রূপ ফুটিয়া না উঠিলে নামের যে সার্থকতা থাকেনা, ইহা তুমি ভুলিয়া যাও। সে কেবল নামটা শোনে, হয়তঃ বা নামটা আওড়ায় ও, কিন্তু জ্বালার

তাহার নিবৃত্তি হয় না, দুঃখের তাহার অন্ত হয় না, ব্যাধি এবং মৃত্যুর কবল হইতেও সে উদ্ধার পায় না। 'মিছে রাম'কে ডাকিয়া কেহ কখনও ভৃত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছে কি? অথবা, কাণা ছেলের নাম 'পদ্মপলাশলোচন' রাখিয়া পিতামাতা কখনও পুত্রের কাণাত্বের ব্যথা ভুলিয়াছে কি? "তুমিই সেই, আমিই সেই" বুঝাইয়া এবং নিজেও অনেক সময় বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিয়া কেহ কখনও ভোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে কি, অথবা, যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে বিস্মৃত হইয়াছে কি? "সর্ব্বভূতে নারায়ণ" উপলব্ধি করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াও সর্প-নারায়ণ, ব্যাঘ্র-নারায়ণ দেখিয়া 'ভাগ্ শালা নারায়ণ' বলিতেও অনেক স্থলেই দেখা যায়না কি?

'গুণাতীত' বলিয়া তুমি তাঁহাকে শিকায় তুলিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেও, যে বিপরীত গুণের সমবায়ে তাঁহার অভিব্যক্তি ও অস্তিত্ব, তাহাত' লোপ করিতে পার নাই। কোনও বিশেষ গুণ ও শক্তি তুমি আকর্ষণ কর নাই, তাই তাঁহার অনন্ত ভাণ্ডার হইতে তোমার প্রাক্তন ও বর্ত্তমান জীবনের অতীত কর্ম্মের ফলে, তোমার পূর্ব্ব আকর্ষণের জোরে, সুখদুঃখ, প্রাচুর্য্য অভাব, হাসি ও কান্না আসিয়া তোমাকে যথাসময়ে তাহাদের ফলভোগী করিয়া থাকে। প্রেম আকর্ষণ করিয়া প্রেমময় হও নাই, তাই হিংসার ভয় তোমার মন হইতে একেবারে দূর হয় নাই— 'ভাগ্ শালা নারায়ণ' কথাটা তোমার প্রাণের অন্তস্তল হইতে উঠিয়া তোমার অজ্ঞাতসারেই তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়!

বলিবে—এখন যখন আমি কিছু আকর্ষণ করিতেছিনা, তখন অতীত আকর্ষণের ফলভোগ হইবার পরে, আমি সুখ-দুঃখের অতীত হইয়া বসিব। জ্ঞাতসারে আকর্ষণ না করিলেও অনেক সময়ে তুমিও অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করিয়া থাক। সুখের লেশ এবং দুঃখের ছায়াও যতদিন পর্য্যন্ত তোমার অন্তরাত্মার উপর আঘাত করিতে থাকিবে, ততদিন আর আকর্ষণের হাত এড়াইলে কৈ ? দুঃখটাকে ভয় কর বলিয়াইত' "দ্বন্দ্বাতীত" হইতে চাও। তবে দুঃখ আকর্ষণ করিতে কখন তোমার ভুল হয় ? দুঃখের চিত্রটা কোন্ সময় তোমার মনে জাগরূক না থাকে ? কাজেই, যতই তুমি বক্তৃতা করনা কেন, যতই তুমি আত্মপ্রতারণা করনা কেন—কর্ম্মের হাত তুমি এড়াইতে পারনা, আকর্ষণ করিতে কখনও তুমি যে বিরত হওনা। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে প্রতিনিয়তই তুমি আকর্ষণ করিতেছ, অতএব জন্মজন্মান্তর তোমার ঘটিবেই ঘটিবে। দুঃখের যদি 'আত্যন্তিক নিবৃত্তি' করিতে চাও তবে সুখ, কেবল সুখ, আকর্ষণ করিতে থাক, ও দুঃখের কথাটা ভুলিয়াই যাও। দুঃখ আপনা হইতেই সরিয়া পড়িবে।

কাজেই, যখন নাম করণ কর, তখন পদার্থের দিক্যে লক্ষ্য রাখিও। নাম যেন তোমার বাঞ্ছিত গুণের সমাবেশে গঠিত একটা পদার্থের সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয় ; নামটা উচ্চারণ করিবামাত্র যেন, একটা উজ্জ্বল চিত্র তোমার মানস চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে। চিত্র যে পরিমাণ উজ্জ্বল হইবে,

ভাবের সেই পরিমাণ বিকাশ হইবে এবং আকর্ষণ-শক্তিও সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে আর আকৃষ্ট বস্তুও সেই পরিমাণে তোমার আয়ত্ত হইবে।

নামটা সমষ্টিভূত গুণের সংক্ষিপ্ত রূপ ; মন্ত্র আবার তাহার অপেক্ষাও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। নামের, মন্ত্রের, কোনই মূল্য নাই, যদিনা উচ্চারণ করা কি মনে করার সঙ্গে সঙ্গে গুণের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়া পদার্থটার প্রতি একটা আসক্তির প্রগাঢ় ভাব জাগিয়া ওঠে।

অতএব, বাস্তবিক যদি তোমার প্রাণে পরের বেদনায় আঘাত লাগে ; তাহার অজ্ঞান, তাহার দুঃখ দৈন্য, তাহার অশান্তি হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাহাকে ফাঁকা কথা, ফাঁকা নাম বলিয়া আরও দুঃখে ফেলিওনা। নামের ফুঁ, কি, মন্ত্রের ফুঁ, আদেশ উপদেশ, যাহাই কেন কাণে দাওনা—পদার্থটা বুঝাইয়া দিয়া আকর্ষণ করিতে শিখাইও। পদার্থটা যেন তোমার ইচ্ছা বা কল্পনা অনুরূপ না হয়, তাহার অভিলক্ষিত গুণের সমবায়ে গঠিত হওয়া চাই।

এই ভাবে, গুণের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে 'মঙ্গলময়' গুণগুলি আকর্ষণ করিতে করিতে যখন সেই গুণের সঙ্গে একীভূত হইয়া যাইবে, তখনই 'দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি'—'মোক্ষ'—লাভ হইবে। মোক্ষের অন্য অর্থ নাই, লাভের অন্য পথ নাই। তখন 'দ্বন্দ্বাতীত' হইয়া নির্ব্বিকার হইবে না—'দ্বন্দ্বরহিত' হইয়া অনন্ত সুখ, অনন্ত শান্তি, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত প্রীতি, অনন্ত প্রেম,

অনন্ত স্বাস্থ্য, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত শক্তি, অনন্ত সিদ্ধি, অনন্ত জীবন, অনন্ত জ্ঞান, অর্থাৎ পূর্ণ মঙ্গল—স্বরূপ হইয়া বসিবে। ইচ্ছায় মৃত্যু, ইচ্ছায় জন্ম হইবে। তোমার স্পর্শে তৃপ্তি, দর্শনে শান্তি এবং বাক্যে সত্য বিজড়িত থাকিবে। তখনই তুমি, 'সেই "মঙ্গলময়" তুমি' হইবে এবং অনুভব করিবে "আমিই সেই মঙ্গলময়''। "অমঙ্গলময় সেই"—তখন তোমার পক্ষে লয় পাইয়া যাইবে। বিশ্বসংসারে ''মঙ্গল ও অমঙ্গলময় সেই-র" ক্রিয়া সমান ভাবে চলিতে থাকিবেই, কিন্তু তুমি সুধু মঙ্গলময়ই হইবে। জগতের উপর দিনরাত্রি সমানভাবে হইতে থাকিলেও, যে সূর্য্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার পক্ষে রাত্রি নাই। ইহাই হইল প্রকৃত ত্যাগ, প্রকৃত মোক্ষ লাভ।

তৃতীয়—মূল মন্ত্র ; অন্তরাত্মা জাগ্রত করা

তোমার প্রাণের অন্তস্তলে, হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে, এমন একটা স্থান আছে, যেখানে আঘাত লাগিবা মাত্রই তোমার শিরায় শিরায় কার্য্যকরী শক্তি বিদ্যুতের মত ছুটিয়া থাকে। তখন তোমার অজ্ঞাতসারেই, আঘাতের প্রকৃতি ও শক্তি অনুসারে, কখনও তোমার চক্ষু ফাটিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়ে, অথবা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে থাকে ; কখনও বা আনন্দে প্রাণ এমনই মাতোয়ারা হইয়া ওঠে যে, এমন যে কঠিন গম্ভীর পুরুষ তুমি, সেই তুমিও বালকের মত সরল তরল হইয়া পড়—কখনও বা দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ কর, অথবা ভক্তিতে মাটিতে লুটাপুটি খাইয়াও তৃপ্ত হওনা! কখনও বা

আবার, তুমি ভাবিয়া চিন্তিয়া লইবার পূর্ব্বেই, তোমার হাত যাইয়া অপরের মাথাটাই কাটিয়া ফেলে! মন হইতে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার প্রকাশ তেমন স্পষ্ট হয় না। অন্তরাত্মার বিচার-শক্তি তখনও অজ্ঞাতসারে ফলাফলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং আইন্-আদালতের কথাটা সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগাইয়া তোলে বলিয়া, মনের ক্রোধ তোমাকে গালিগালাজ, চড়-চাপড়ের বেশি কোন কাজে প্রবৃত্ত করিতে পারেনা। কিন্তু ক্রোধের কারণটা যখন এমন প্রবল ও আকস্মিক হয় যে, ক্রোধটা একেবারে অন্তরাত্মা হইতে উদ্ভূত হয়, তখন আর আইন্-আদালতের কথা তোমার মনেই আসে না; তুমি অনায়াসে, যাহার উপর ক্রোধ হয়, তাহার মাথাটাও কাটিয়া ফেল! প্রত্যেক ভাব সম্বন্ধেই এই কথা। অন্তরাত্মায় ভাবের আন্দোলন উত্থিত হইলে, দেশ কাল পাত্র ভুলিয়া, বৃদ্ধও বালকের মত উলঙ্গ হইয়া নাচিয়া থাকে অথবা ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলে—একবারও তাহার মনে হয় না, কে কি বলিবে।

এই যে স্থানটা, এটাই হইল তোমার অন্তরাত্মা। এখানে আঘাত লাগিয়া শক্তির উদ্ভব না হইলে মানুষের হৃদয়ে ঐকান্তিক ভাব ও নিষ্ঠার স্থান হয় না, এবং ভাবে বিভোর হইয়া মানুষ, সহজ অবস্থায় যাহা অসাধ্য, তাহা সাধন করিতে পারেনা। যে কথা, যে ঘটনা, যে দৃশ্য, তোমার "মর্ম্ম" স্পর্শ করে, তাহার চিত্র এই খানেই অঙ্কিত রহিয়া যায়, এবং জাগ্রত ও নিদ্রা-

বস্থায় অনেক সময় তোমার মানস চক্ষুর সম্মুখে উদিত হইয়া তোমাকে আস্বাদিত-পূর্ব্ব সুখ ও দুঃখ আবার আস্বাদ করাইয়া থাকে।

যে মন দিয়া তুমি বহির্জ্জগতের সঙ্গে আদান প্রদান করিতেছ, তাহা বহির্ম্মুখী, সর্ব্বদাই বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। যে ভাব তরঙ্গ এই মন আলোড়িত করিয়া, তাহার অন্তস্তলে অবস্থিত অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত পৌঁছায় না, সেই ভাব সতত-চঞ্চল; যে ক্রিয়ায় তাহার প্রকাশ, তাহাও সাধারণতঃ অসার ও অস্থায়ী। তোমার জীবনের সাধারণ কাজগুলির মূলে যে ভাব ও ইচ্ছা, তাহা এই মন হইতে উদ্ভূত হয়। কাজেই ভাবও গাঢ় হয় না, ইচ্ছাও প্রবল হয় না, এবং ইচ্ছার পূরণও কদাচিৎই হইয়া থাকে।

কখনও সকল ইন্দ্রিয়-পথে একসঙ্গে বিষয়-বাতাসের স্রোত আসিয়া মনটাকে দশ দিকে চালিত করিয়া থাকে; তখন কোনই কার্য্য হয় না। কখনও বা কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয়-পথে অধিকতর প্রবল বাতাস আসিয়া একদিকে মনটাকে অপেক্ষাকৃত প্রবলবেগে ঠেলিয়া লইয়া যায়। এই সময়ে যে রকম হউক একটা ভাবের, এবং সবল হোক্ দুর্ব্বল হোক্ একটা ইচ্ছারও বিকাশ হয়। এটাই হইল তোমার সাধারণ অবস্থা; কিন্তু এ সময়েও একটা ইচ্ছা জাগরিত হইয়া পূর্ণ হইতে না হইতেই অপর শত ইচ্ছা জাগরিত হইয়া পরস্পরকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।

কিন্তু কোনও সময়ে না কোনও সময়ে কোনও বিশেষ

ইন্দ্রিয়-পথে এমন প্রবল একটা ঝাপ্‌টা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তখন মনে যে তরঙ্গ ওঠে, তাহাতে মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া পড়ে। এই সময়ে যে ভাবের ও যে ইচ্ছার উদ্ভব হয় তাহার শক্তি আসে, মন হইতে নয়, অন্তরাত্মা হইতে। এই যে ইচ্ছা—ইহার শক্তি অমোঘ, ইহা পূর্ণ হইবেই হইবে।

যদি সিদ্ধিলাভ করিতে চাও—অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত সুখ, অনন্ত মঙ্গল যাহাই কেন চাও না—'মনে' ইচ্ছা না করিয়া 'অন্তরাত্মায়' ইচ্ছা করিও। অন্তরাত্মা জীব ও শিবের মধ্যবর্ত্তী। জীব মনের দাস, সেই মন দিয়া ইচ্ছা করে, সেই মন দিয়া ভগবান্‌কে ডাকে ; কাজেই তাহার ডাক ভগবানের কাণে পৌঁছে না, ইচ্ছাও পূর্ণ হয় না, কারণ শিবের সঙ্গে যে মনের সোজা সংযোগ নাই। মনের ডাক যদি অন্তরাত্মায় পৌঁছায়, অন্তরাত্মা তখন তোমার নিবেদন শিবের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। তুমি ঢাকা হইতে বোম্বে সহরে কি সোজা 'তার' প্রেরণ করিতে পার? ঢাকা আপিস তোমার সংবাদ কলিকাতার কেন্দ্র আপিসে পাঠাইলে, সেখান হইতে বোম্বে যাইয়া পৌঁছে, নতুবা কিছুতেই পৌঁছিবে না। তোমার মন যখন অন্তরাত্মার দ্বারে আঘাত করিবে, অন্তরাত্মায় তখন ইচ্ছার উদ্ভব হইবে এবং সেই ইচ্ছা ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে তোমার ঈপ্সিত বস্তু আকর্ষণ করিয়া আনিবে।

সাধারণ জীবনে তুমি এমনই বহির্ম্মুখ হইয়া রহিয়াছ যে, দুঃখের বেদনা কিংবা সুখের কোমল স্পর্শ কিছুই তোমার

অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছে না। তবে একথা ঠিক যে, সুখ অপেক্ষা দুঃখের আঘাতটা প্রবলতর, এবং অনেক সময় সেটা কিয়ৎ পরিমাণে অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়াও থাকে। তাহার ফলে দুঃখের কথা, দুঃখের স্মৃতি তোমার মনটাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখে এবং অন্তরাত্মাও ক্রমশঃ অধিকতর দুঃখই আকর্ষণ করিয়া আনিতে থাকে।

যে দুঃখ তোমার মনে তরঙ্গ তুলিয়া অন্তরাত্মার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাকে বাধা দাও। তাহার বিপরীত বস্তুটাকে—যাহা পাইলে এ দুঃখের আর সম্ভাবনা থাকিবে না—কল্পনা ও ভাবনা দ্বারা পুষ্ট করিয়া মন তাহাতে বাঁধিয়া ফেল। আরও ভাবিতে ভাবিতে, কল্পনায় সেই সুখের উজ্জ্বল চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া উপভোগ করিতে করিতে, মনটাকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া অন্তরাত্মার দিকে ছুটাইয়া দাও। যতই তন্ময় হইয়া এই সুখের তুমি কল্পনা করিবে, অন্তরাত্মার আকর্ষণী শক্তি, ততই বিকশিত ও পুষ্ট হইতে হইতে, সেই সুখ তোমায় বহন করিয়া আনিয়া দিতে থাকিবে। অন্তরাত্মা হইতে যখন ইচ্ছা ধাবিত হয়, তখন আপনার শক্তিতে সে এমন শক্তিমান যে, 'বিঘ্ন' তাহার লক্ষ্যই হয় না—'ত্যাগের' কথা তাহার আমলেই আসে না। বিঘ্ন ও ত্যাগ সে বোঝেই না। 'সিদ্ধিলাভ করিব' এই প্রবল বিশ্বাসে সে ছুটিয়া চলে এবং সাধারণ অবস্থায় যাহা অজেয় বিঘ্নস্বরূপ, অনায়াসে তাহা পদ-দলিত করিয়া আপনাকে পূর্ণ করিয়া থাকে। বাড়ীতে যখন আগুণ লাগে, তখন গৃহস্বামীর ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহেও

এমনই শক্তির সঞ্চার হয় যে, সহজ অবস্থায় সে যদি আধ মণ ভারী জিনিষও তুলিতে না পারে, তখন সে অনায়াসে এক মণ ওজনের জিনিষও তুলিয়া লইয়া যায়! এ শক্তি তাহার কোথা হইতে আসে?—আসে অন্তরাত্মার বিশ্বাস হইতে। 'পারিব', কি, 'পারিব না' মনের এই যে ভাব, তখন তাহাতে স্থান পায় না—'বিঘ্ন' বলিয়া কোন জিনিষ সে স্বীকার করে না।

প্রথমতঃ বহির্ম্মুখী উদ্দাম চঞ্চল মনটাকে অন্তরাত্মার দিকে টানিয়া নিতে বেগ পাইতে হইবে। অনেক সময় ভাবটা গাঢ় হইয়া কল্পনা সজীব করিয়া তুলিতে পারিবে না। তাই দুর্ব্বল-কল্পনা-পুষ্ট ভাবটা যাইয়া অন্তরাত্মায় আকর্ষণী ইচ্ছা-শক্তিও জাগাইতে পারিবে না। কিন্তু হতাশ হইও না; 'অভ্যাস-যোগে'র শরণ লইও। ক্রমশঃ মন বহির্জগৎ হইতে বিচ্যুত হইয়া স্থির হইয়া আসিতে ও কল্পনার মধুর আস্বাদ পাইয়া তাহাতে নিবদ্ধ হইয়া বসিতে থাকিবে এবং তখন কল্পনা যাইয়া অন্তরাত্মার নিকট তোমার নিবেদন জানাইবে। তখন অদম্য ইচ্ছা-শক্তি জাগরিত হইয়া সুধু যে তোমার তখনকার অভীপ্সিতই প্রদান করিবে তাহা নহে; অন্তরাত্মায় উদ্ভূত সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করিবে। এমন কি, তোমার ঐকান্তিক ইচ্ছা হইলে, ভগবানের যে অনন্ত গুণরাজি তুমি আকর্ষণ করিতেছ, তাহারা সমবেত হইয়া তোমার ইষ্ট মূর্ত্তিই গ্রহণ করিবে এবং তোমার সঙ্গে আলাপ-ব্যবহার ও করিবে।

মন্ত্র ও ধ্যান, তোমার ঈপ্সিত গুণরাজির দিকে তোমার

বহির্ম্মুখী মনটাকে আকৃষ্ট করিবার কৌশল মাত্র। মন্ত্র নামের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। যে মন্ত্র, যে নাম লইলে তোমার অভীপ্সিত গুণরাজির চিত্র জাগিয়া ওঠে, সেই নাম, সেই মন্ত্র তুমি লইতে পার। গুণগুলি যদি পরিষ্কার ভাবে তোমার মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে, নাম কি মন্ত্রের তোমার কোনই প্রয়োজন নাই। তোমার ধ্যেয় মূর্ত্তি তোমার আরাধ্য গুণাবলির জমাট্ রূপমাত্র বলিয়া ইহার উপর মনটা সহজেই নিবদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু মূর্ত্তিতে যদি গুণগুলি উজ্জ্বল ভাবে না ফুটিয়া ওঠে, কিংবা মূর্ত্তি ছাড়াও যদি গুণগুলির উপরে মন নিবদ্ধ হইতে পারে, তবে মূর্ত্তির কোনই প্রয়োজন নাই। মোট কথা, গুণগুলিই তোমার ধ্যেয় ও ইষ্ট। যে ভাবে পার, সেইগুলিতে বহির্ম্মুখী মনটাকে লয় করাইয়া দিবে। ইহাই জপ, ইহাই ধ্যান।

আজ যে বিমান-রথ দেখিতেছ, যে রথ তোমাকে বহন করিয়া শূন্যে উঠিতেছে, দেশ দেশান্তরে লইয়া যাইতেছে—সেটা তোমারই সৃষ্টি। তুমি তাহাকে যে রূপ ও যে শক্তি দিয়াছ, সেই রূপ ও শক্তি লইয়াই সে তোমার কার্য্য করিতেছে। বাহ্য রূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে এই বিমান-রথের উদ্ভব হইয়াছিল তোমার মনে। আকাশে উড়িবার একটা বাসনা তোমার বহির্ম্মুখী মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই বাসনা হইতে কল্পনা জাগিয়া ওঠে ; কল্পনা অর্থাৎ ধ্যান করিতে করিতে তুমি তন্ময় হইতে থাক। অর্থাৎ তোমার অন্তরাত্মার উপর তোমার কল্পনা কার্য্য করিতে থাকে। ক্রমে সেখানে ইচ্ছা ও আশার উদ্ভব

হয়, এবং সেই ইচ্ছা ও আশার আকর্ষণে যে বিমান-যানটা এক দিন তোমার মনের একটা ভাবমাত্র ছিল, আজ তাহা মূর্ত্তিমান হইয়া তোমার শত প্রয়োজন সাধন করিতেছে!

সেইরূপ, তোমার আরাধ্য গুণগুলির সমাবেশে একটা মূর্ত্তি গড়িয়া লইয়া যদি তাহার সঙ্গে তোমার আলাপ ব্যবহার করিতে প্রবল বাসনা হয়, তবে কল্পনা সেই মূর্ত্তি প্রথমে তোমার মানস চক্ষুর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিয়া তোমার মনটাকে বাহিরের দিক্ হইতে একে একে টানিয়া আনিয়া তাহাতে নিবদ্ধ করিয়া ফেলিবে। তখন অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠিয়া তাহাতে জীবন সঞ্চার করিবে। মূর্ত্তি তখন 'বর'দান করিবে—কথা বলিবে। কিন্তু সে বর, সে কথা, অন্তরাত্মারই বর, তাঁহারই কথা। অতএব, ইচ্ছা হইলে তুমি মূর্ত্তি গড়িয়া ভগবানের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিতে পার, আর ইচ্ছা না হইলে, নাও করিতে পার। কিন্তু অন্তরাত্মা দিয়া যে ইচ্ছা করিবে, যে গুণ আকর্ষণ করিবে, উভয় পথেই তাহা সমান ভাবে লাভ হইবে।

আসল কথা—বহির্ম্মুখী মনকে অন্তর্ম্মুখী করা ও অন্তরাত্মাকে জাগরূক করা। ইহাই হইল সিদ্ধিলাভের মূল মন্ত্র। অন্তরাত্মা যখন জাগ্রত থাকে, তখন একটা সাধারণ কথায়ও এমন একটা পূর্ব্বানুস্মৃত ভাবের তরঙ্গ উঠিয়া মানুষকে আকুল করিয়া তোলে যে, তখন আর তাহার সাধারণ জ্ঞানের দিক্ বিদিক্, হিতাহিত বোধ থাকে না। সাধারণ অবস্থায় যাহা সে কল্পনাও করে নাই কিংবা মনে হইলেও শিহরিয়া

উঠিয়াছে, তখন অনায়াসে সে সেই দুষ্কর কার্য্যও করিয়া বসে। 'বেলা ত' গেল' কথাটা লালা বাবু জীবনে শত সহস্র বার শুনিয়াছিলেন ; কিন্তু শুনিয়াছিলেন চঞ্চল মন দিয়া। একদিন যে কোন কারণে মনটা নিস্তেজ ছিল—বহির্জ্জগতের সঙ্গে তেমন সম্বন্ধ ছিল না। এই অবস্থাটাকে সাধারণ ভাষায় আমরা 'উদাস-উদাস' ভাব বলি এবং সকলের জীবনেই অল্পবিস্তর অনুভবও করিয়া থাকি। একদিন লালাবাবুর মনের যখন এই উদাস-উদাস ভাব, তখন তাহার কাণে প্রবেশ করিল "বেলা ত' গেল !"—মন নিস্তেজ, কথাটা যাইয়া একেবারে অন্তরাত্মায় আঘাত করিল। অন্তরাত্মাই পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান জন্মের সংযোগ-সূত্র অথবা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। সেই আঘাতে পূর্ব্ব জন্মের অনুস্মৃত বৈরাগ্যের ভাবটা প্রবল ভাবে জাগিয়া উঠিল—পরিবারের মমতা, সংসারের বন্ধন ঐ এক কথায় ছিন্ন হইয়া গেল !

অতএব, অন্তরাত্মাকে জাগাইয়া তুলিয়া ঈপ্সিত গুণগুলি ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আকর্ষণ করিতে থাক। ইহাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য এবং প্রকৃত সাধনা।

অন্তরাত্মাকে জাগাইতে হইলেই মনটাকে নিস্তেজ করিতে হইতে হইবে। কিন্তু চাপিয়া ধরা অথবা বাঁধিয়া রাখা ত' আর চলিবে না। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের পথে বাহির হইতে শত প্রলোভন, শত আশঙ্কা আসিয়া ইহাকে নাচাইয়া তুলিতেছে। তুমি বল একটু ঠাণ্ডা হইয়া বসিতে, সে আরও উদ্দাম ভাবে নাচিতে আরম্ভ করে !

নিস্তেজ করিতে হইলে কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি ইহাকে ধাবিত করিতে চেষ্টা কর। খুব সোজা, যার মধ্যে বিশেষ কোনও ভাজগোঁজ নাই এমন একটা জিনিষ হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া খুব ভালরূপে দেখিয়া লও। যখন বুঝিবে ইহার সকলই দেখিয়াছ, কোথায় কোন্ বিশেষত্বটি আছে তাহা ঠিকই তোমার নজরে পড়িয়াছে, তখন চক্ষু বুজিয়া সেই জিনিষটার চিত্রটি মানস চোখে দেখিবার চেষ্টা কর। একবারে হোক্ দশবারে হোক্, একদিনে হোক্ দশ দিনে হোক্—যতক্ষণ না এই চিত্রটি তুমি ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে, ততক্ষণ এইভাবে চলিতে থাকিবে। শেষে একদিন নিশ্চয় চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তখন অপেক্ষাকৃত জটিল বিষয় লইয়া কাজ আরম্ভ করিও। ক্রমে দেখিতে পাইবে, যে বিষয়েই তুমি চিন্তা করিতে বসনা কেন, অন্যান্য বিষয় হইতে উঠিয়া আসিয়া মন তাহাতেই ডুবিয়া যায়। তখন আর ইন্দ্রিয়-পথে বহির্ম্মুখী আকর্ষণ আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইতে কিংবা নাচাইয়া তুলিতে পারে না। ভগবানের আরাধ্য গুণগুলির সমবায়ে গঠিত একটা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহার ধ্যান ও ধারণার যে কথা, তাহারও এই লক্ষ্য। ক্রমে ধ্যেয় বিষয়ে মনটা এতই ডুবিয়া যাইবে যে, ধ্যেয় মূর্ত্তির সঙ্গে তুমি একীভূতই হইয়া যাইবে—তোমার পক্ষে বহির্জ্জগৎটা তখনকার মত একেবারে লয় পাইয়া যাইবে। তখন অন্তরাত্মা সম্পূর্ণ জাগরূক হইয়া বসিবেন, এবং বিশ্বেশ্বরের অনন্ত ভাণ্ডারের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ সংযোগ রহিয়াছে বলিয়া

তাঁহার আকর্ষণে তোমার ঈপ্সিত বস্তু আসিয়া তোমার বাসনা পূর্ণ করিবে।

উদ্দাম গতিতে চলন্ত এঞ্জিনের গতি হঠাৎ রোধ করিতে হইলে গার্ড 'ব্রেক্' কষিয়া থাকে। যাই 'ব্রেক্' কষা, অমনি সাপের মাথায় ধূলা পড়িল, হুঁস্ হুঁস্ ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে এঞ্জিন স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মন-রূপ এঞ্জিন্টাকে দমাইয়া আনিতেও ভগবান্ এইরূপ একটা 'ব্রেক্' এর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। গার্ড তুমি ঘুমাইয়া রহিয়াছ বলিয়া 'ব্রেকের' দিকে তোমার লক্ষ্য ও হয় না, 'ব্রেকের' উপর তোমার হাত পড়েনা; কাজেই মন, যে ভাবে ইচ্ছা, যে দিকে ইচ্ছা, তোমাকে লইয়া ছুটিয়া যাইতেছে।

শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াটা এই 'ব্রেক্'। একটু ভিতরের দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারিবে, কথাটা কত সত্য। যখন ছুটাছুটি করিয়া হাঁপাইতে থাক, তখন লক্ষ্যটা যায় শ্বাসের দিকে এবং অন্য ভাবনা চিন্তা, সকলই মনটা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। আকস্মিক্ বিপৎ-পাতের কিংবা অপ্রত্যাশিত সুখের সংবাদটা যখন তোমার কাণে প্রবেশ করে, লক্ষ্য করিও, দেখিবে, তখন শ্বাস-প্রশ্বাস স্থির হইয়া আসিতেছে এবং মনটাতেও, যে কথা তুমি শুনিলে, সেই কথা ছাড়া অন্য কথার স্থান নাই।

তাই, মন নিস্তেজ করিতে হইলে, শ্বাস-প্রশ্বাসটার দিকে

লক্ষ্য করিতে শিখিও। শ্বাস টানিয়া ভিতরে কতদূর পর্য্যন্ত বায়ু চালনা কর, এবং প্রশ্বাস ফেলিবার সময় কোন্ স্থান হইতে বায়ু বাহির হইতে থাকে, প্রথমে তাহা কয়েকবার লক্ষ্য করিয়া অভীষ্ট বিষয়ের প্রতি মনঃ সংযোগ করিতে চেষ্টা করিও। এই ভাবে, যুগপৎ শতবিষয়ে চিন্তা-পরায়ণ মন প্রথমে স্থির হইয়া পরে একটি মাত্র বিষয়ে চিন্তা করিতে শিখিবে এবং ক্রমে তাহাতে ডুবিয়া যাইবে।

মনঃ সংযমের আর একটী উপায় হইতেছে, চিন্তা করা যে, আমার কামক্রোধ প্রভৃতি রিপুগুলি সাম্যভাব ধারণ করিয়াছে; আমার মন শান্ত হইয়াছে। আমি সাম্যভাব ধারণ করিয়াছি, আমিই মূর্ত্তিমান সাম্য। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনে সাম্যের একটা চিত্র ফুটিয়া উঠিবে, এবং মন বাস্তবিকই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাছুটি ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ধীর ও শান্ত হইয়া আসিবে।

আর একটা কথা কখনই ভুলিও না। দেশলায়ের কাঠির মাথায় যে সামান্য একটু কালো বস্তু থাকে, তাহাতেই বিশ্বগ্রাসী অনলের লেলিহান্ জিহ্বা লুক্কায়িত আছে। জলে ভিজাও, সে জিহ্বা কখনই বাহির হইবে না; হয়ত একটু একটু করিয়া সে কালো বস্তুটা খসিয়াই পড়িবে। বাক্সের গায়ে তাহার সমধর্ম্মী কালো বস্তুটার যে একটা বিস্তৃত প্রলেপ থাকে, সেই প্রলেপটার উপর ঘষিলে, সেই কালো কণিকাটা তখন আপনার উজ্জ্বল তেজোময় রূপ ধারণ করিয়া যাহা দাও তাহাই নিজস্ব—নিজের সঙ্গে একীভূত—করিয়া লইতে চাহিবে।

তোমার অন্তরাত্মাটা দেশলায়ের কাঠির মাথার সেই কালো কণিকাটুকু—কিন্তু বিশ্বগ্রাসী শক্তি ইহাতে নিহিত। মন-রূপ জলে তুমি ইহা ভিজাইয়া রাখিয়াছ ও কালো প্রলেপটার উপর না ঘষিয়া যেখানে সেখানে ঘষিতেছ বলিয়া, আগুন আর জ্বলিতেছেনা। বহুকাল জলে ভিজিয়া কণিকা স্যাঁৎসেঁতে হইয়া পড়িয়াছে—অস্থানে ঘষায় ঘষায় অনেকটা ক্ষয়ও পাইতে বসিয়াছে। আবার জ্ঞানের উত্তাপে বিশুষ্ক করিয়া লও, আশার ভাণ্ডার হইতে কালো বস্তুটা নূতন করিয়া মাখিয়া লও, এবং ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডার-রূপ কালো প্রলেপটার সঙ্গে তাহার সংযোগ সাধন কর—তখন দেখিবে, সেই দেশলায়ের মাথার ক্ষুদ্র কণিকাটুকুর কি তেজ, কি আভা!

অসীমানন্ত ভগবানের অংশ তুমি, তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদ্বারাই অনুপ্রাণিত, তাঁহা হইতে অভেদ। বিশ্বসংসারের যেদিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে, একই ভাবে সকলেরই জন্ম, স্থিতি ও লয়। অতএব মণিমালার অন্তর্নিহিত অলক্ষ্য সূত্রটির মত 'একটা বস্তু' যে এই অসংখ্য মণিগুলিকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহা তোমার বিচার-বুদ্ধিই তোমাকে বলিয়া দিবে।

সেই একের অনন্তমুখী শক্তি, অপরিমেয় প্রভাব। "তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আমি, তাঁহা হইতে অভেদ আমি—আমারও অনন্ত শক্তি, অপরিমেয় প্রভাব"—তোমার অন্তরাত্মাই তখন তোমাকে এ কথা বলিয়া দিবে। আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তার তোমার অপরিসীম শক্তি, সে শক্তি তুমি খর্ব্ব করিও না। অনন্ত

ভাণ্ডারের মালিক হইয়া, কণিকার আশা করিয়া, তদনুরূপ চিন্তা করিয়া, আপনার অনন্ত শক্তি তুমি সীমাবদ্ধ করিও না। যাহা চাও, তাহার অনন্ত ভাণ্ডার ধরিয়া টান দাও; যত জোরে টান পড়িবে, তত বেগে ও তত পরিমাণে ভাণ্ডার হইতে রত্ন আসিতে থাকিবে। রৌদ্র, বায়ু ও জলের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে সকলেই যথেচ্ছ গ্রহণ করিতেছে, তথাপি কাহারও সঙ্গে কাহারও দ্বন্দ্ব নাই। প্রত্যেকেই অনন্ত ভাণ্ডারের মালিক—অনন্ত পরিমাণে ভোগ করিতেছে। ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডারের অন্যান্য রত্নও এই ভাবেই অনন্ত পরিমাণে ভোগ করা যায় অথচ কাহাকেও বঞ্চিত করা হয় না এবং নিজেরও কখনও বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা নাই।

'কোনও প্রকারে দশটা টাকা আনিতে পারিলেই হইল', এইরূপ আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা যাহার, তাহার প্রাপ্তি দশ টাকার মধ্যেই হইবে। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আর যাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা পরিমাণের গণ্ডী বদ্ধ নহে, যে 'পারিব কি না পারিব' চিন্তা না করিয়া 'নিশ্চয় পারিব' এই বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে চায়, সে যে শীঘ্রই অনেক উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসে, আমেরিকা ও ইউরোপে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। ধনে বিজ্ঞানে, শিল্পে সাহিত্যে সে দেশের লোক তাই এত উচ্চে। প্রত্যেক বিষয়েই এই ভাবে অপরিমেয় সিদ্ধি লাভ করা যায়, এবং সূর্য্যকে ধরিয়া থাকিলে

যেমন রাত্রির পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমন অনন্ত ভাণ্ডারের সঙ্গে অবিচ্ছেছ্য যোগ সাধন করিতে পারিলে, অমঙ্গল, দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ শোক তাপ, জরাব্যাধি মৃত্যুর সহিতও পরিচয় হয় না।

পরম পদ

প্রথম অধ্যায়

চিত্তের প্রফুল্লতা

প্রার্থিত বস্তু পাইতে হইলে যে ভাবে চলিতে হইবে—যে সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে—পরবর্ত্তী অধ্যায়-সমূহে তাহার একটা সরল ও পরিস্ফুট আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে।

কিন্তু সেই প্রণালী অনুসারে যথাযথ ভাবে কাজ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে যাহা করিতে হইবে, এই খানে তাহা বলিয়া লই।

দর্পণ নির্ম্মল এবং স্থির না হইলে, তাহাতে প্রতিবিম্ব পরিষ্কার রূপে পড়িতে পায়না। কখনও শত শত পদার্থের চিত্র পরস্পর পরস্পকে আবৃত ও বিতাড়িত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়। ফলে, কাহারও স্থিতি লাভ হয় না।

আমাদের চিত্তটি আমাদের ভাবের দর্পণ—ভাবের চিত্র ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়া আমাদিগকে বিভোর করিয়া থাকে। চঞ্চল মনে একসঙ্গে নানা ভাবের বিকাশ হয়। কাজেই চিত্তের উপর একসঙ্গে ভাবের উপরে ভাব ফুটিয়া ওঠে, কোনটিই

পরিষ্কার ও স্থায়ী হয় না; কোনও ভাবের চিত্র দেখিয়াই অন্তরাত্মা বিভোর হয় না—কাজেই কোন ভাবই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করে না।

অতএব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, চিত্ত বেশ নির্ম্মল ও প্রফুল্ল রাখিতে হইবে; এবং ইহা করিতে হইলে, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ইহাদিগকে ত্যাগ কি দমন করার চেষ্টা উভয়ই বৃথা। সুধু বৃথা নয়, সেই চেষ্টা বরং ইহাদিগকে অধিকতর সবল ও পুষ্ট করিয়া থাকে। নদীর মুখে বাধ বাঁধিলে তাহার বেগই বাড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং বাধের উপর সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি না রাখিলে এবং যখন যে মেরামত আবশ্যক তাহা না করিলে, দুইদিন আগে আর পরে, জল বাধ ভাঙ্গিয়া ছুটিবেই ছুটিবে। রিপু-দমনই যদি জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ত্যাগ ও দমনের বাধ কতক পরিমাণে সফল হইলেও হইতে পারে। কিন্তু যদি অন্য লক্ষ্য থাকে, তবে কখনই দৃষ্টি বাধের উপর থাকিতে পারে না, কাজেই অতর্কিতে কাম ক্রোধ লোভ মোহের প্রবল বন্যা আসিয়া একদিন না একদিন বাধ ভাঙ্গিয়া কিম্বা ডিঙ্গাইয়া তোমাকেই একবারে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

যে ভাবগুলি মনে হইয়া তোমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতে চায়, যতদিন না তোমার মনের বহির্ম্মুখী গতি অন্তর্ম্মুখী হইয়াছে, ততদিন অল্পবিস্তর পরিমাণে তাহারা তোমার মনে উঠিবেই

উঠিবে। কিন্তু যদি তুমি তা'দের হাতে আত্মসমর্পণ কর—তবে সিদ্ধিলাভ অনেকটা পিছাইয়া পড়িবে।

ত্যাগও করিতে পারিবেনা, দমনও করা চলিবে না, তবে কি করা হইবে? প্রত্যেক বিষেরই প্রতিষেধক আছে, সেই প্রতিষেধকের শরণ লইতে হইবে। ক্রমে ম্যালেরিয়া-বিষের মত সেই বিষটা একেবারে দূরীভূত হইয়া যাইবে।

প্রথমতঃ, সকল বিষের যে একটা সাধারণ প্রতিষেধক আছে, তাহার শরণ লও। ইহা হইল প্রফুল্ল চিত্ত। যাহার প্রাণের ভিতর হাসির তরঙ্গ সর্ব্বদাই নাচিতেছে, তাহার দেহে ও মুখে একটা উজ্জ্বল আভা, একটা মধুর ভাব সর্ব্বদাই ফুটিয়া থাকে। সে যে হাঁটে, তাহাতে মাটিও যেন আঘাত পায় না; সে যে রাগে, সে রাগেও যেন জ্বালা নাই। অন্যের যে অপরাধ তুমি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নও, তাহার সেই অপরাধও তুমি অনেক সময় অনেকটা সহিয়া লও। কাজেই পরের ক্রোধ হিংসা প্রভৃতি তাহাকে কমই ভোগ করিতে হয়—এবং যখন ভোগ করিতে হয়, তখনও স্বাভাবিক আনন্দের ভাবটা তাহাকে অনেকটা আবরিয়া রাখে। শোক দুঃখ প্রভৃতি আসিয়াও অনেক সময় তাহার মনের দ্বার হইতেই ফিরিয়া যায়, ভিতরে আর প্রবেশ করিতে কিম্বা কোনও প্রকারে প্রবেশ করিলেও স্থির হইয়া বসিতে পরে না।

এই প্রফুল্লতার ভাবটা আনিতে ও বদ্ধমূল করিতে হইলে, শোক দুঃখের যে তুমি অতীত, তাহা তোমাকে আগে বুঝিয়া

লইতে হইবে। শ্বাসে প্রশ্বাসে, হাঁটিতে চলিতে, সর্ব্বদা ভাবিবে —মঙ্গলময়ের অংশ আমি, মঙ্গলময় হইতে অভেদ আমি, আমিই মঙ্গল, আমিই মঙ্গল, আমিই মঙ্গল।

তুমি হয়তঃ হাসিতেছ, ভাবিতেছ—'আমিই মঙ্গল, আমিই মঙ্গল' করিয়া কি কেহ কখনও মঙ্গল পাইতে পারে, না, মঙ্গল-স্বরূপ হইয়া বসিতে পারে!—যখন তুমি ক্রোধে কি কামে দিশাহারা হও, অন্য চিন্তা, অন্য ভাব থাকে না, তখন মুখে না বলিলে কিংবা মনে মনে চিন্তা না করিলেও কি তুমি ক্রোধের এবং কামের মূর্ত্তি হইয়া বস না? আয়নায় মুখ দেখিও—দেখিবে, তখন আপনাকে চিনিতে পার না, ঠিক সেই স্বাভাবিক মূর্ত্তি নাই। তখন তুমি ক্রোধ, তুমি কাম। ক্রোধ যদি তুমি হইতে পার, কাম যদি তুমি হইতে পার, তবে মুখে বলিতে বলিতে ও মনে ভাবিতে ভাবিতে মঙ্গলের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মঙ্গল তুমি হইবে না কেন? সাত দিন এই ভাবে কাজ করিয়া দেখিয়া যদি হাসিতে পার, ত' হাসিও। 'আমিই মঙ্গল আমিই মঙ্গল' ভাবিতে ভাবিতে মঙ্গলের একটা চিত্র তোমার মানস চক্ষুর সম্মুখে নিশ্চয় ফুটিয়া উঠিয়া তোমাকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করিবে। তখন বাহিরের অমঙ্গল আর তোমার মনের উপর তেমন আধিপত্য প্রকাশ করিতে পারিবে না।

তোমার মনে হইবে, সুধু আত্মার দৃঢ়তা বাড়াইবার জন্য, সুধু মঙ্গলময় ভাবটা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার জন্য, বহির্জগৎ আমার ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, লোভ জন্মাইবার চেষ্টা

করিতেছে। ক্রোধ প্রভৃতির কারণ একবার উপেক্ষা করিতে পারিলে, যে চিত্ত-প্রসাদ অনুভূত হইবে সেই চিত্ত-প্রসাদ ভবিষ্যতে তোমাকে আরও শক্তিমান করিয়া তুলিবে।

যখন ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইবে, তখন কোন প্রীতিপ্রদ ঘটনা বা কথা মনে করিতে চেষ্টা করিও, ক্রোধ আপনিই মন্দীভূত হইয়া আসিবে। ভাবিও—আমি অক্রোধ, আমি ক্ষমা। রূপ-লালসা বলবতী হইলে মায়ের স্নেহ-মধুর মুখ মনে করিতে চেষ্টা করিও। যাহার রূপ তোমাকে আকুল করিয়াছে, সে যে রূপ-সাগরের সামান্য একটু কণিকার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, ইহা ভাবিও, রূপ-লালসা কমিয়া যাইবে। আর ভাবিও—আমি তৃপ্তি, আমি তৃপ্তি।

এই ভাবে, যখন যে রিপু তোমাকে অভিভূত করিতে চাহিবে, তাহার বিপরীত ভাবের চিত্র মনে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিও। দেখিবে, বড় বেশী দিন লাগিবেনা, রিপু দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছে, মন ক্রমশঃ সাম্য ভাব ধারণ করিতেছে। যখন কাহারও ব্যবহারে কিম্বা কোন ঘটনায় মন উত্যক্ত হইতে চায়, দৃঢ় ভাবে ভাবিও—আমি সাম্য, আমি সাম্য; আমি সহিষ্ণুতা, আমি সহিষ্ণুতা।

এমন কি, যখন নিদ্রা আসে না, তখন সুখে নিদ্রিত কোনও ব্যক্তির চিত্র কল্পনা করিতে করিতে ভাবিও—আমি নিদ্রা। দেখিও, নিদ্রা আসে কিনা। পরীক্ষা করিয়া, হাসিতে পার, হাসিও।

কয়েক দিন এই ভাবে চলিলেই বুঝিতে পারিবে, চিত্ত কত স্থির, কত প্রফুল্ল হইয়াছে। আগে যে দুঃখ কষ্টে এত বিচলিত হইয়াছ, এখন কেমন তুমি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দাও।

চিত্ত যতই প্রফুল্ল হইবে, ততই প্রাণে আশা আকাঙ্ক্ষার উদয় হইবে—চিন্তা-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে।

হাসিমুখ সকলেই দেখিতে ভালবাসে। যে মুখ ভার করিয়া থাকে, তাহার সঙ্গে জগতের কেহই প্রাণ খুলিয়া মিশে না; অর্থাৎ হাসিমুখের আকর্ষণী শক্তি বেশী। চিত্ত যত প্রফুল্ল হইবে, আকর্ষণী শক্তি ততই বাড়িবে, অযাচিত সাহায্য লইয়া জগৎ ততই তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে। তোমার সিদ্ধিলাভের পথ সুগম হইবে।

নিজের দেহের উপরও প্রফুল্ল চিত্তের প্রভাব বড় অল্প নয়। খাইয়া পরিয়া, শুইয়া বসিয়া যাহার সুখ নাই, সংসারে যে সুখের জিনিষ দেখিতে পায়না, তাহার মুখেই হাসি ফোটে না। স্ফূর্ত্তির অভাবে তাহার মনের সদ্বৃত্তিগুলি ক্রমে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, এবং মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া থাকে। শাক ভাত খাইয়া কৃষকের ছেলে প্রাণে আনন্দ পায়, তাই তাহার দেহ বলিষ্ঠ ও স্ফূর্ত্তিবান্ হয়। আর ঘি, দুধ, মাছ মাংস খাইয়াও ধনীর ছেলে যে শুকাইয়া যায়, তাহার কারণ স্ফূর্ত্তির অভাব, স্বার্থপরতার প্রভাব।

একটি সুন্দরী যুবতী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করেন—তাহার হরিণ-নয়নের কোলে কালি পড়িতে থাকে। আত্মীয়

স্বজন সকলেই চিন্তিত হইল, বাহিরে কোন ব্যাধির প্রকাশ নাই; ধনে জনে গৃহ পরিপূর্ণ, স্বামীও বিদ্বান্, সুস্থকায় এবং প্রেমময়। বাহ্যতঃ কোনই অভাব অসুবিধা নাই, তবে, কেন শরীর শুকায় ?

ডাক্তারের পর ডাক্তার আসিতেছে; কিন্তু কোনই ফল হইতেছে না। অবশেষে একজন ডাক্তার আসিলেন। রোগিনীকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়াও যখন তিনি কোনই ব্যাধির পরিচয় পাইলেন না, তখন বলিলেন, "মাফ্ করিবেন, আপনার প্রাণে একটু আঘাত না দিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। আপনার কোনই ব্যাধি নাই, কোনও অভাবও নাই, অথচ আপনি এমন স্বার্থপর যে, আপনার দেহ মন কিছু না চাহিলেও, আপনি বাড়ীর সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন! আমাকে দিয়া যদি চিকিৎসা করাইতে চা'ন—তবে পরের জন্য একটু ভাবিতে, পরের জন্য একটু খাটিতে শিখুন। আর আমি 'প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন্' লিখিয়া দিতেছি। আমি চলিয়া যাইবার আধ ঘণ্টা পরে ইহা খুলিয়া পড়িবেন ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন।"

'প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন্' লিখিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। আধ ঘণ্টা পরে যুবতী পড়িয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, লেখা রহিয়াছে—প্রত্যেহ তিনবার করিয়া একটা দর্পণের সুমুখে দাঁড়াইয়া হাসিবেন, ইহাতে আপনার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া উঠিবে। মধ্যাহ্নে, বৈকালে ও রাত্রে ভোজনের পূর্ব্বে তিনবার হো হো করিয়া হাসিবেন

ইহাতে আপনার যকৃতের ক্রিয়া ভাল হইবে। এবং সকাল ও সন্ধ্যায় বেশ দুই মাইল রাস্তা হাঁটিয়া আসিবেন, ইহাতে সর্ব্বাঙ্গে ও সকল ইন্দ্রিয়ে রক্ত চলাচল হইবে।”

যুবতী খুব হাসিলেন—এমন অদ্ভুত চিকিৎসা প্রণালীতে সকলেই হাসে। ডাক্তারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। যখন মনে হইত, তখনই পেট ফাটিয়া রমণীর হাসি আসিত। সময় সময় বা একটা নূতনত্বের আস্বাদ লইবার জন্য অথবা পরিহাসের ভাবেই তিনি ডাক্তারের সকল ব্যবস্থাই পালন করিতেন। বৎসরের মধ্যেই তাহার মুখ প্রফুল্ল, চিত্ত উদার এবং শরীর স্ফূর্ত্তিতে ও শক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত এতদূর প্রফুল্ল হইয়া পড়ে যে, তখন সংসারের সকল বস্তুই উপভোগের সামগ্রী হইয়া থাকে, এবং সমস্ত জীবনটাই একটা সুখের স্বপ্ন হইয়া বসে।

আর একটি যুবতীর কথা জানি, স্বভাবতঃই তিনি প্রফুল্লমুখী। অভ্যাসে সে প্রফুল্লতার ভাব এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, কেহ কখনও তাহার মুখ ভার দেখে নাই। সংসারী করিতে গেলে সময় সময় একটু হিংসা, একটু ক্রোধের কারণ সকলেরই উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেখানেও তাহার মুখে হাসি ধরে না—স্বামী তিরস্কার করিতেছেন আর তিনি চোখে মুখে হাসিতেছেন!

এত স্ফূর্ত্তি স্বামীর ভাল লাগিল না। একদিন ভাবিলেন “ইহাকে না ক্ষেপাইয়া ছাড়িতেছি না।” বাজারে যাইবার

সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ কি কি আনিতে হইবে ?" যাহা যাহা প্রয়োজন যুবতী বলিয়া দিলেন। স্বামী কিন্তু তাহার কিছুই না আনিয়া যাহা খুসী, তাহাই লইয়া আসিলেন। ভোজন করিতে যাইবার সময় মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন "আজ দেখা যাবে !" পত্নী থালা লইয়া আসিলেন—চোখে মুখে তেমনই হাসি। ইহার পরে একদিন জ্বালানি কাষ্ঠ আনিতে যাইয়া স্বামী বাছিয়া বাছিয়া গিরায় গিরায় আকাঁবাঁকা কতকগুলি কাঠ লইয়া আসিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে রান্না-ঘরে যাইয়া দেখিলেন, ধোঁয়ায় চক্ষু লাল হইয়া গিয়াছে। তখন কপট মমতা দেখাইয়া তিনি বলিলেন "আঃ, একি করেছি আমি ! চোখ যে ফুলে লাল হয়েছে ! যাও, আর ধরাতে হবে না—নূতন কাঠ এখনই কিনে এনে দিচ্ছি !"—মনে ভাবিলেন—এবার স্ত্রীর কণ্ঠটা নিশ্চয় একটু চড়িয়া উঠিবে। কিন্তু তাহা হইল না—চোখের জলের ভিতর দিয়াও হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন "না, না, আর তোমার যেতে হ'বে না। এ কাঠগুলো দামে কম, জ্বলে ধীরে ধীরে কিন্তু আঁচটা বেশ হয়। এখন থেকে এগুলোই এনো।" স্বামী মনে মনে হার মানিলেন ; প্রফুল্লমুখীর জয় হইল।

এমনভাবে যদি চিত্ত প্রফুল্ল রাখ্‌তে পার, তবে এম্‌নিতেই সংসারটা অনেক সুখের হয়ে উঠ্‌বে না ?

যখন বলিবে ও ভাবিবে, "আমি মঙ্গল, আমি সাম্য, আমি ক্ষমা, আমি অর্থ,"—তখন মুখ বন্ধ করিয়া নাসা-পথে জোরে শ্বাস

টানিয়া এইরূপ ধীরে ধীরে তালে তালে ভাবিতে থাকিও। শ্বাস ফেলিবার সময় মুখ ও নাসিকা উভয়ে পথেই শ্বাস ছাড়িও এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ ভাবিও। ইহাতে মনটা কতক সংযত হইয়া আসিবে ও ভাবটা গাঢ় হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চিন্তার প্রভাব অসীম, ইহা বুঝিয়াই প্রাচীন মনীষী বলিয়াছিলেন, "চিতাচিন্তাদ্বয়োর্ম্মধ্যে চিন্তা এব গরীয়সী।" এটা হইল চিন্তার এক দিক্—যাহাকে আমার দুশ্চিন্তা বলিয়া থাকি। এই চিন্তার ধ্বংশ-সাধিকা শক্তি এতই বেশি যে, প্রথমতঃ মন শীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ করিয়া ইহা দেহ জীর্ণ ও মস্তিষ্ক দুর্ব্বল করে এবং ক্রমে উন্মত্ততা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটন করিয়া থাকে।

চিন্তা করিতে করিতে একরাত্রেই মাথার কালো চুল সাদা হইয়া গিয়াছে, যুবকের দেহ বৃদ্ধের মত জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, পক্ষাঘাত জন্মিয়াছে, হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া রোধ হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে—বিজ্ঞ চিকিৎসক ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত তোমায় দিতে পারিবেন। তাহারা ইহাও তোমায় জানাইয়া দিবেন—চিন্তার ফলে তোমার মাংস-তন্তুগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, গ্রন্থি হইতে অতিরিক্ত স্রাব নির্গত হয় এবং যে রক্ত-কণিকাগুলি

জীর্ণ তন্তুর সংস্কার করে, গ্রন্থি স্রাবের অপচয় পূরণ করে, এবং রোগের বীজাণু বিনাশ করিয়া তোমাকে সুস্থ ও সবল রাখে, সেই রক্ত-কণিকাগুলিও বিনষ্ট হয়।

ক্রোধ লোভ প্রভৃতির মূলে অলক্ষ্য চিন্তা। অনেক সময় তুমি লক্ষ্য করনা বটে, এবং মনে কর, অমুকের ব্যবহারেই আমার রাগ হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার ব্যবহার নহে, তাহার ব্যবহারের ফলাফল সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞাতসারেই তোমার মনে যে চিন্তার উদয় হইয়াছে তাহাই তোমাকে রাগাইয়াছে। দারুণ ক্রোধ, দুর্জ্জয় কাম তোমার দেহের উপর কিরূপ ক্রিয়া করিয়া থাকে, সেই সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের জিজ্ঞাসা করিও। তাহারা বলিবেন—এইরূপ ক্রোধ প্রভৃতির পরে শরীরের রক্ত একেবারে বিষাক্ত হইয়া যায়। এমনও দৃষ্টান্ত তাহারা দেখাইতে পারিবেন যে, খুব রাগারাগি ঝগড়াঝাটি করিয়া মা যখন কোলের শিশুকে মাই দিয়াছেন, তখন অনেক সময়ই শিশুর পেটে অসুখ ও বমি-বমি ভাব হইয়াছে, দুই এক স্থলে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুও হইয়াছে।

পরের চিন্তা ও ভাব, এমন কি একটা অতর্কিত অথবা সাধু-ইচ্ছা প্রণোদিত কথাও তোমার মনে ধ্বংশ-সাধক ভাব ও চিন্তার বিকাশ করিয়া তোমাকে মরণের পথে টানিয়া লয়। তোমার হিতৈষী বন্ধুও তোমাকে দেখিয়া যখন বলেন—"একি, তুমি এমন শুকাইয়া গিয়াছ!", তখন তিনিও জানেন

না, তুমিও বোঝনা যে তোমার কি অনিষ্টের বীজ রোপিত হইল! তোমার মনে আশঙ্কা ও উদ্বেগ অলক্ষ্যে স্থান লইল, আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া মুখ দেখিয়া তুমি বলিয়া উঠিলে, "হাঁ, তাই ত!"—ধীরে ধীরে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া তোমাকে ক্রমে ব্যাধিগ্রস্তই করিয়া থাকে।

অতএব, যাহাতে মনে কুভাব ও কুচিন্তা স্থান না পায়, প্রথমে তোমাকে তাহা করিতে হইবে। চিত্ত যদি প্রফুল্ল করিতে পার, তবে সহজে ইহাদের স্থান হইবে না। যে বই পড়িলে, যে লোকের সঙ্গ করিলে, যাহার কথা শুনিলে, যে দৃশ্য দেখিলে মনে ক্রোধ, লোভ, হিংসা, কাম প্রভৃতি ভাবের উদয় হয়, তাহারা তোমার হিতৈষী বন্ধু নহে। তোমার বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে, প্রাণে সন্দেহ আশঙ্কা ভয় উদ্বেগ জাগাইয়া তোলে, এমন লোকও তোমার আপনার জন নহে। ইহাদিগকে ভাল বাসিও না—ইহাদিগের সঙ্গ করিও না। তবেই তোমার আকর্ষণের অভাবে ইহারা আপনা হইতেই সরিয়া পড়িবে।

কুচিন্তার মত সুচিন্তার, প্রভাবও অসীম। যতই তুমি মঙ্গলের চিন্তা করিবে, মঙ্গলময় সাম্য, শান্তি, সুখ, ঐশ্বর্য্য, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির চিন্তা করিবে, ততই তোমার চিত্ত নির্ম্মল ও মনের সদ্বৃত্তিগুলি বিকশিত হইবে। তাহার ফলে তোমার রক্ত-কণিকা বিশুদ্ধ হইয়া তোমার দেহ সুস্থ ও সবল এবং প্রাণে তেজ, উৎসাহ, আশা ও বিশ্বাস সঞ্চারিত করিবে।

চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লও, মঙ্গল অমঙ্গল একসঙ্গে থাকিতে পারে না। ইহা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করিতে থাক। অমঙ্গল উপস্থিত হইলে—তোমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে অর্থাৎ পূর্ব্ব আকর্ষণের ফলে কিছুদিন পর্য্যন্ত, যতদিন না ভয় সন্দেহ আশঙ্কা প্রভৃতির সংস্কার তোমার মন হইতে লয় পাইয়া যায় ততদিন পর্য্যন্ত, ইহা উপস্থিত হইবেই। কিন্তু দেখিবে তোমার বিশ্বাস, মঙ্গলে তোমার দৃঢ় আস্থা, অচিরে ও অল্পায়াসেই তাহা বিদূরিত করিবে; অনেক সময় তুমি নিজেও বুঝিতে পারিবে না, কেমন করিয়া বিপদ্ কাটাইয়া উঠিয়াছ। অমঙ্গল উপস্থিত হইলে, দৃঢ় ভাবে ভগবানের মঙ্গলময়গুণগুলির কথা চিন্তা করিতে থাকিও। তোমার নিজের জীবনে দেখিয়াছ, পরের মুখে শুনিয়াছ, পুরাণ ও ইতিহাসে পড়িয়াছ, ভগবানের মঙ্গলময় গুণের এইরূপ যে যে পরিচয় তুমি পাইয়াছ, সেইগুলি স্মরণ ও চিন্তা করিতে থাকিবে। দেখিবে, প্রাণে বিশ্বাস, বল ও আশার কেমন সঞ্চার হয় এবং অমঙ্গল আপনা হইতেই কেমন শীর্ণ হইতে থাকে!

আরও গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিবে, মঙ্গলময়ের অংশ তুমি—অমঙ্গল তোমাকে স্পর্শ করিতেই পারেনা। তখন প্রাণপণে সেই বিশ্বাস আঁকড়িয়া ধরিয়া অমঙ্গলের দিকে পেছন ফিরিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে—অন্তরাত্মা হইতে—হাঁক ছাড়িতে থাকিও, আমিই মঙ্গল, আমিই মঙ্গল। দেখিবে, বাস্তবিকই তুমি মঙ্গল হইয়াছ।

সদাসর্ব্বদা হাঁটিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, "আমি মঙ্গলময়, আমি মঙ্গলময়" এই চিন্তা করিতে কখনই ভুলিওনা। 'আমি রেগে আগুন হয়েছি' শুনে তুমি অবিশ্বাস কর না—হাসনা, তবে "আমি মঙ্গল হয়েছি" শুনে তোমার অবিশ্বাস করিবার, হাসিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। যে আগুন হইতে পারে, সে জলও হইতে পারে। রেগে যদি বাড়ীশুদ্ধ লোককে আমি উত্যক্ত করিতে ও রাগাইতে পারি, তবে মুখে "আমি শান্তি, আমি শান্তি" করিতে করিতে বাড়ীশুদ্ধ ক্রুদ্ধ লোককে হাসাইয়াও আমি শান্ত করিতে পারি। তার পরে, মনে মনে "শান্তি শান্তি" করিতে করিতে মনের উপর শান্তির যে একটা ছাপ পড়িয়া যায়, ক্রমে তাহা আমার কথায় ও কার্য্যে বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে ও শান্তিরই একটা আব্‌হাওয়া গড়িয়া তোলে। দুরন্ত শিশু যখন শান্ত হইয়া ঘুমাইতে থাকে, মা তখন সকলকে সাবধান করিয়া দেন, কেহ যেন তাহাকে না জাগায়। যে 'শান্তি শান্তি' করিতে করিতে শান্ত হইতে থাকে, তাহাকে উত্যক্ত না করিবার জন্য ভগবান্‌ও সেইরূপ তাঁহার অশান্তিময় গুণগুলিকে সংযত করিয়া রাখেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কল্পনা ও ধ্যান

চিন্তার সঙ্গে কল্পনা বিজড়িত। যে বিষয়েই তুমি চিন্তা করিতে বস না কেন, একটুপরেই কল্পনা তোমাকে সেই বিষয় হইতে ছাড়াইয়া অনেক দূরে লইয়া যায়, এবং নানা রঙ্গে সেই বিষয়টাকেও রঞ্জিত করিয়া থাকে। যাহার কল্পনা যত প্রবল, তাহার উন্নতি ও অধোগতি উভয়েরই পথ তত প্রশস্ত। মানুষের সাধারণ স্তর হইতে যে বিষয়েই যাহারা উন্নতি লাভ করে, সে বিষয়েই প্রথমে কল্পনা তাহাদিগকে নূতন রাস্তায়, নূতন যানে বহন করিয়া লইয়া যায়—তারপরে কার্য্যে তাহারা তাহা পরিণত করে। যাহারা অধোগতি অবলম্বন করে, তাহাদেরও বেগ এবং পতনের ভীষণতা কল্পনা-অনুযায়ী হইয়া থাকে। বড় পণ্ডিত, বড় সেনাপতি হইতে হইলেও যেমন কল্পনাই প্রধান অবলম্বন, বড় চোর, বড় ডাকাত হইতে হইলেও ইহা তেমনই অবলম্বন। যাহাদের কল্পনা-শক্তি দুর্ব্বল অথবা নাই, তাহারা কোনদিকেই বড় হইতে পারেনা। শিশুরা যখন খেলিতে থাকে, তখনও লক্ষ্য করিলে, দেখিতে পাইবে, যে কল্পনা-প্রিয়, সে নিত্য নূতন খেলার অবতারণা করিয়া দলপতি হইয়া বসে; আর যাহার নিজের কল্পনা নাই, সে তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে,

অথবা গৃহস্থালীত যাহা দেখিয়াছে পুতুল লইয়া তাহারই অনুকরণ করে—ভাত রাঁধে, ভাত খাওয়ায়, বিবাহ দেয়। যদ্দৃষ্টং তৎকৃতং। এ রকমের মানুষ ডোবার জল।

দারুণ ভয়, উদ্বেগ, আশঙ্কা, কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতির মূলেও কল্পনা; আবার প্রবল আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা প্রেম, প্রীতির মূলেও তাহাই। কল্পনাই তিলকে তালে পরিণত করিয়া একদিকে ভয়ে ম্রিয়মান, অপরদিকে আশায় উৎফুল্ল করিয়া থাকে; একদিকে কলাগাছে ভূত দেখায়, অপরদিকে কালো রূপের উপর বিদ্যুৎ চম্‌কায়।

শিশুর যখন অসুখ হয়, মায়ের কল্পনা তখনই প্রবল বেগে কার্য্য করিতে থাকে। একমুহূর্ত্তে মৃত্যুর দৃশ্যটি পর্য্যন্তও তিনি দেখিয়া ল'ন আর হৃদয়ের তেজ ও সাহস এবং দেহের বল ও শক্তি হারাইয়া বসেন! আবার এক টাকার হাঁসের ডিম বিক্রয় করিতে যাইয়া মুহূর্ত্তেই, কল্পনার প্রভাবে, রাজা হইয়া বসার দৃষ্টান্তও অল্প নহে!

আমাদের প্রতি কার্য্যের মূলেই চিন্তা ও কল্পনা। কল্পনায় আমাদের উন্নতি এবং অবনতি উভয়ই সাধিত হয়। যে কল্পনায় প্রাণ সঙ্কুচিত হয়, সন্দেহ অবিশ্বাস ভয় উদ্বেগ পুষ্ট ও বলবান্ হয়, তাহা আমাদিগকে মরণের পথে লইয়া যায়। বিঘ্নটাকে বড় ও আপনাকে ছোট কল্পনা করিতে করিতেই, যাহারা একদিন আকাশে বেড়াইয়াছে, আজ তাহারা মাটির উপরেও স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে পায়না; আর যাহারা একদিন বনে জঙ্গলে পশুর

সঙ্গে পশু সাজিয়া বেড়াইয়াছে, উচ্চ হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর অবস্থার কল্পনা করিতে করিতে আজ তাহারাই আকাশে উড়িতে সমর্থ হইয়াছে। তাহাদের কল্পনায় আশা, বিশ্বাস, সাহস ও শক্তি বিকশিত ও পুষ্ট হইয়াছে, তাই তাহারা বড় হইয়াছে!

ভগবানের শক্তি অপরিমেয় ও অজয়। সেই শক্তির অধিকারী আমি—আমিই সেই শক্তি। এই কথাটা সুধু মনে হইলেও প্রাণে বলের সঞ্চার হয়।

সর্ব্বনাশী কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে তোমাকে বড় বেগ পাইতে হয় না—সে-ই তোমাকে বেশ টানিয়া নীচের দিকে লইয়া যাইতে পারে; এবং আত্মীয়বন্ধু, সমাজ ও সংস্কার অনাহূত ভাবে আসিয়া তাহার শক্তি বেশ বাড়াইয়া দিয়া থাকে। তুমি যখন মনে ভাব, দশটাকার বেশি আমার মূল্য নয়, তখন কয়জন বন্ধু আসিয়া তোমাকে দেখাইয়া দেয় যে, তোমার অপেক্ষা হীন লোকও হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে ও করিতেছে? যাহার নিকট যাও, যাহার সাহায্য প্রার্থী হও, সে-ই বলে, "যে দিনকাল পড়েছে, তোমার চাইতে উপযুক্ত লোকই দশটাকা পায়না। পাও যদি ত' ঢের!"—তোমাকে আরও নামাইয়া দিল নাকি?

কিন্তু যে কল্পনার প্রভাবে দুর্য্যোগ সুযোগে পরিণত হয়, অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উদ্ভব হয়, আকাশের মৃত্যুগর্ভ বিদ্যুৎ ঘরে বসিয়া হাওয়া করে ও আলো দেয়, মাটির মানুষ আকাশে বেড়ায়, সে কল্পনা বড় সহজে মূর্ত্তিমান হইয়া বসেনা।

প্রথমতঃ ; যাহা বা যাহারা তোমার এই উন্নতি-অভিমুখী কল্পনায় বাধা দেয় তাহাদিগকে যদি উপেক্ষা করিতে না পার, —ভগবান্ অনন্ত শক্তি, যাহাইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন ; তাঁহা হইতে অভেদ আমি, তাঁহার শক্তিতেই শক্তিমান আমি, অতএব যাহাইচ্ছা আমিও তাহাই করিতে পারি, ইহা যদি বিচারে তুমি না জানিয়া থাক কিম্বা বুঝিলেও দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতে না পার,—তবে তাহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদিগের অবিশ্বাস ও দুর্ব্বলতা গ্রহণ করিওনা। যত দিন পর্য্যন্ত নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপিত না হয় ; যত দিন পর্য্যন্ত, নিজে যাহা বুঝিয়াছ তাহাই ঠিক, এই বিশ্বাস অকাট্য না হয়, ততদিন আপনার কল্পনার কথাও তাহাদিগকে বলিও না।

দ্বিতীয়তঃ ; নির্জ্জনে শান্ত মনে বসিয়া তোমার আরাধ্য ভগবানের মঙ্গলময় গুণ বা গুণগুলির বিষয় চিন্তা করিতে থাকিও। যে যে ব্যাপারে সেই সকল গুণের অসাধারণ বিকাশ দেখিতে পাইয়াছ, সেইগুলি ভাবিয়া ভাবিয়া গুণগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিও। কল্পনার চোখে দেখিতে থাকিও যেন ভগবানের সেই গুণ-ভাণ্ডার হইতে অজস্রধারায় তোমার উপর সেই গুণগুলি বর্ষিত হইতেছে এবং মনে মনে ভাবিতে থাকিও—আমি অমুক অমুক গুণ। ক্রমে কল্পনা তোমাকে সেই গুণে গুণবান্ করিয়া তোমার চোখের সাম্‌নে ধরিতে থাকিবে। ইহাই ধ্যান। ধ্যান যতই গাঢ় হইবে, শক্তিরও তোমাতে ততই সঞ্চার হইতে থাকিবে।

এই মঙ্গলময় গুণগুলি স্মরণ করিতে বসিয়া, মন যদি তাহাতে নিবদ্ধ করিতে না পার, তবে সেই সকল গুণের সমবায়ে মনোহর একটি মূর্ত্তি হৃদাকাশে গড়িয়া লইও ; ভাবিতে ভাবিতে মূর্ত্তিটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিও। এই গুণগুলিতে কিম্বা মূর্ত্তিটিতে বহুমুখী মন যত লয় পাইতে থাকিবে, তুমিও তত তন্ময় হইতে থাকিবে ; এবং মূর্ত্তি বা গুণের চিন্তা যতই উজ্জ্বল হইবে, সিদ্ধিও ততই সহজ ও নিকটবর্ত্তী হইবে।

তার পরে, কল্পনা করিবে যেন তুমি সেই সকল গুণের অধিকারী হইয়াই বসিয়াছ—যেন সেই সেই গুণের অনুরূপ কার্য্য তুমি করিতে আরম্ভ করিয়াছ। অর্থ যদি তোমার ইষ্ট হয়, কল্পনা করিবে যেন সকল অর্থের যে অনন্ত ভাণ্ডার, তাঁহা হইতে তোমার উপর অজস্রধারায় অর্থের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে—কখনও বিরাম নাই, কখনও লাঘব নাই। অর্থ হইলে যাহা যাহা তুমি করিবে ভাবিয়াছ, কল্পনায় সেই সেই কাজ করিতে থাকিবে। এই ভাবটা সর্ব্বদাই হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিবে। যখন বাস্তব জগতে তোমার কল্পনার বিপরীত কোনও ঘটনা ঘটিয়া তোমাকে কাতর ও সঙ্কুচিত করিতে চাহিবে, তখন জোরে জোরে নিজের বিশ্বাস আঁকড়িয়া ধরিয়া ভবিষ্যতের সুখের চিত্র বর্ত্তমানে মানস চোখের সম্মুখে আঁকিতে চেষ্টা করিও। দুঃখের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, 'নাঃ, কিছুই হইলনা, কোনই উপায় দেখ্‌ছিনা !' এইরূপ বলিয়া বলিয়া অথবা কেবল দুঃখেরই আশঙ্কা করিয়া, যাহা লাভ হইয়াছে, তাহা ত'

এপর্য্যন্ত দেখিয়াছ। এখন একবার দুঃখটাকে উপেক্ষা করিয়া ও সুখের কল্পনা করিয়া দেখ, জীবনে নূতন তেজ ও আশার সঞ্চার হইতে হইতে শক্তিময়ী কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইয়া বসে কিনা।

ক্রমে যখন গুণে বা মূর্ত্তিতে ও তোমাতে আর ভেদ থাকিবেনা, তোমার বহির্জ্জগতের অস্তিত্ব তুমি ভুলিয়াই যাইবে, তখনই তুমি সেই সকল গুণের অনন্ত আধার হইয়া বসিবে।

সারাদিন যাহাতে তোমার কল্পনা-অনুযায়ী জীবনটা কাটাইতে পার, কখনও যাহাতে কামক্রোধ সন্দেহ অবিশ্বাস আসিয়া তোমার চিত্ত চঞ্চল করিতে বা তোমার বিশ্বাসে আঘাত করিতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবে। তাহা না হইলে, সিদ্ধিলাভ পিছাইয়া পড়িবে।

প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিবার পরে এবং রাত্রিতে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে, 'আমি শান্তি, আমি শৃঙ্খলা, আমি সাম্য' কয়েকবার এইরূপ ভাবিয়া, ও নিম্নে বিবৃত প্রাণায়ামের কার্য্য করিয়া, এইরূপ ধ্যান করিবে। প্রাতে কি রাত্রের কোনই অর্থ নাই। অন্য যে কোন সময়ে তোমার সুবিধা হয় তখনও করিতে পার।

তুমি হয়তঃ বলিবে, যে অর্থ চায় সে কি আর 'আমি অর্থ, আমি অর্থ' ভাবিয়া কিম্বা অর্থের ধারা কি মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলেও অর্থ পাইতে পারে ?

সংসারে যেমন কাজ কর্ম্ম সে করিতেছে, তেমনই সে করিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার বিশ্বাস ও ধ্যান তাহার উপর ভগবানের

অনন্তভাণ্ডার হইতে যে অজস্র ধারা আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে, তাহাই, সেই কর্ম্মের ভিতর দিয়া এবং আবশ্যক হইলে উচ্চতর কর্ম্মে তাহাকে উন্নীত করিয়া অথবা কর্ম্মান্তরে তাহাকে নিয়োজিত করিয়া, তাহার হাতে অর্থের স্রোত বহাইয়া আনিবে।

মানুষের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রথমে তাহা সুধুই মনের কল্পনা ছিল। কল্পনায় তন্ময় হইতে হইতে সাধক উপাদান ও গঠন-প্রণালী মনে মনেই স্থির করিয়া লইয়াছে এবং তখন আপনা হইতেই যেন তাহার হাত পা প্রভৃতি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কল্পনায় তন্ময় হইয়া কল্পিত বস্তু মানস চোখে প্রত্যক্ষ না করিলে কেহ তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেনা—চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রথমে যে বিদ্রূপ পরিহাস ও গঞ্জনা তাহার উপর বর্ষিত হয়, তাহাই তাহাকে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য করিত।

চতুর্থ অধ্যায়

মনঃসংযম, অন্তরাত্মার সঙ্গে সংযোগ সাধন ও তাঁহার নিকট নিবেদন

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্তরাত্মাই শিব ও জীবের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্র ষ্টেশন ; এবং জন্মজন্মান্তরের অন্তস্তল দিয়া যে একটা অবিচ্ছিন্ন জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই অন্তরাত্মা। এই অন্তরাত্মায়ই তোমার পূর্ব্ব জীবনের চিন্তা, ভাব ও কর্ম্ম-জনিত বিশ্বাস ও সংস্কার নিহিত রহিয়াছে। ইহাকে জাগাইলেই, সেই বিশ্বাস ও সংস্কার প্রবল হইয়া তোমাকে পূর্ব্বানুসৃত পথে টানিয়া লইয়া যাইবে—যেমন দস্যু রত্নাকরকে, বিল্ব মঙ্গলকে এবং লালা বাবুকে লইয়া গিয়াছে।

অন্তরাত্মাই জীব ও শিবের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্র ষ্টেশন বলিয়া জীব সোজাভাবে শিবের ভাণ্ডার হইতে আপনার ইষ্ট আকর্ষণ করিয়া লইতে পারেনা। তাহাকে অন্তরাত্মার নিকট নিবেদন করিতে হইবে, এবং অন্তরাত্মা তখন শিবের ভাণ্ডার হইতে আকর্ষণ করিয়া তাহার ইষ্ট আনিয়া তাহার হাতে পৌঁছাইয়া দিবে।

অতএব অন্তরাত্মাকে জাগরিত করা, প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহার সঙ্গে সংযোগ সাধন করিয়া আপনাকে জাগরিত করা ও তাহার

নিকট নিবেদন করা একান্ত প্রয়োজন। ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মনটা আমাদিগকে সর্ব্বদাই বহির্ম্মুখী করিয়া রাখিয়াছে। এই মনটাকে সংযত করিয়া প্রথমে অন্তর্ম্মুখী ও পরে নিষ্ক্রিয় করিতে না পারিলে অন্তরাত্মার সঙ্গে সংযোগ সাধন কিম্বা তাহার নিকট নিবেদন করা যায়না।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে যে ভাবে চিন্তা, কল্পনা ও ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে, তাহা অভ্যাস করিতে করিতে মন আপনিই সংযত হইয়া আসিবে।

মন স্বভাবতঃ এমন উদ্দাম ও চঞ্চল যে চিন্তা করিতে বসিয়া প্রথমে দেখিতে পাইবে যে, তাহাকে আর একটা বিষয়ে বাঁধিয়া রাখিতে পারনা। ভগবানের কথা ভাবিতে বসিয়াছ ; যখন খেয়াল হইয়াছে, তখন দেখিবে, কোথায় সাপ বাঘ ভূত প্রেতের রাজ্যে যাইয়া পড়িয়াছ !

তাই পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, প্রথমে খুব একটা সরল বস্তু লইয়া মনঃসংযম অভ্যাস করিতে বসিবে। যখন সেই জিনিষটার চিত্র যখন ইচ্ছা তখনই মানস চোখের নিকট উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিবে, তখন বুঝিবে মন তোমার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে বসিয়াছে। ক্রমে জটিলতর বস্তু লইয়া এই ভাবে অভ্যাস করিতে করিতে যখন বুঝিবে, যে বস্তু ইচ্ছা, তাহারই মূর্ত্তি তুমি ভিতরে ফুটাইয়া তুলিতে পার, তখন গুণ লইয়া অভ্যাস আরম্ভ করিও। সুবিধার জন্য গুণকেও একটা মূর্ত্তি দিয়া লইতে পার।

এই ভাবে যখন দেখিবে, মন তোমার বশ্যাতা সম্পূর্ণ স্বীকার

করিয়াছে, তখন ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে যে মঙ্গলময় অনন্ত গুণগুলি তুমি পাইতে ইচ্ছা কর, সেই গুণগুলি একত্রে শৃঙ্খলিত ভাবে অথবা তাহাদের সমবায়ে গঠিত একটি উজ্জ্বল মনোহর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহার চিন্তায়—ধ্যানে—বসিয়া যাইবে। গুণগুলি জীবন্ত করিয়া না তুলিতে পরিলে, মন তাহাতে তেমন আকৃষ্ট হইবে না। তাই কল্পনার সাহায্য লইতে হইবে। যে যে কার্য্যে, যে যে ঘটনায় সেই সকল গুণের পরম বিকাশ দেখিয়াছ, প্রথমে সেই গুলির কথা ভাবিতে থাকিবে। রস পাইয়া মন তাহাতে আপনা হইতেই মজিতে থাকিবে। তার পরে ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার উপর সেই গুণের অজস্র ধারা বর্ষিত হইতেছে ইহা কল্পনা করিতে থাকিবে। মন আরও ডুবিয়া যাইবে—ক্রমে সেই ধারাগুলি চাক্ষুষই করিতে পাইবে। তখন অন্তরাত্মার নিকট নিবেদন করিবে—এই নিবেদনে বিশ্বাস অধিকতর বদ্ধমূল এবং ভাব অধিকতর গাঢ় হইবে, কারণ তখনও অজ্ঞাতসারে সাধারণ জীবনের দীনতা ও হীনতার সংস্কারগুলি তোমাকে আত্মশক্তিতে সন্দিহান্ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে। আপনার অপেক্ষা ক্ষমতাবানের নিকট নিবেদন করিলে স্বভাবতঃই প্রাণে আশা ও সাহসের সঞ্চার হয়। অন্তরাত্মার নিকট নিবেদন করিবে—ওগো, আমার অন্তর্য্যামী অন্তরাত্মা, বিশ্বেশ্বরের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে অবিরত অজস্র ধারায় তুমি আমার উপর এই এই গুণগুলি (নাম করিয়া) এই মুহূর্ত্ত হইতেই আকর্ষণ করিয়া আনিতে থাক। একবার,

দুইবার, তিনবার করিয়া ক্রমেই অধিকতর বার অন্তরাত্মার নিকট নিবেদন জানাইতে থাকিবে। তারপর আপনাকেই সেই সকল গুণে অন্বিত মনে করিয়া কল্পনায় তাহার ফল ভোগ ও বিতরণ করিতে থাকিবে। এই ভাবে ভাবিতে ভাবিতে ও কল্পনা করিতে করিতে ভাব ক্রমশঃ গাঢ় হইতে থাকিবে, মন তাহাতে একেবারেই ডুবিয়া যাইবে এবং ভাব যাইয়া অন্তরাত্মার দ্বারে আঘাত করিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া তুলিবে, এবং তাঁহার জাগরণে দেহে পুলক সঞ্চার ও রোমাঞ্চ এবং নয়নে আনন্দের আভা কিম্বা অশ্রু ফুটিয়া উঠিবে।

এই ভাবে অভ্যাস করিতে করিতে মনের সঙ্গে অন্তরাত্মার সংযোগ এমনই সরল ও দৃঢ় হইয়া যাইবে যে, মনে যে কোন ইচ্ছার উদ্রেক হইলেই তাহা যাইয়া অন্তরাত্মায় আঘাত করিবে।

ভগবানের অনন্ত মঙ্গলময় গুণগুলির এই ভাবে ধ্যান করিতে করিতে যখন তুমি তন্ময় হইয়া যাইবে, তখন অন্তরাত্মা তাঁহার ভাণ্ডার হইতে সেই গুণগুলির অজস্র অবিচ্ছিন্ন ধারা তোমার উপর আকর্ষণ করিয়া আনিতে থাকিবে, এবং সেই গুণগুলির সমবায়ে গঠিত করিয়া তুমি যদি মনে মনে কোনও মূর্ত্তি গড়িয়া লইয়া থাক, অন্তরাত্মা তখন তাহাতে জীবন সঞ্চার করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত করাইবে। তুমি তখন তাঁহার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে পাইবে। যেমন তোমারই একদিনকার মনের কল্পনা আজ ঘড়ি, বাষ্পীয়পোত, ব্যোমযান প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া তোমার মনে অতুল

আনন্দদান ও তোমার অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিতেছে, ঠিক তেমনই ভাবে তোমার কল্পিত মূর্ত্তিই তোমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া তোমার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধন করিবে ও তোমাকে ভগবৎ সাক্ষাৎকারের সুখ উপভোগ তখন করাইবে। ইচ্ছা করিলে, অর্জ্জুনের মত, তাঁহার দ্বন্দ্বে গঠিত বিরাট্ রূপও দেখিয়া লইতে পারিবে।

এই ভাবে যখন পরম সিদ্ধি লাভ হইবে, তখন, সংসারের সঙ্গে সংযোগ নিবন্ধন যখন যে ইচ্ছার তোমার প্রাণে উদ্ভব হইবে, তখনি তাহা পূর্ণ হইবে। ইহাই খণ্ড সিদ্ধি।

প্রত্যহ সাধন করিতে বসিয়া প্রথমে আপনাকে অভীপ্সিত ভগবানের মঙ্গলময় গুণগুলিতে অন্বিত ভাবিতে থাকিবে; তারপরে ভাবটা যখন গাঢ় হইয়া প্রাণে আশা ও বিশ্বাস জাগাইয়া তুলিবে, তখন খণ্ড সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য করিবে, এবং ঠিক ঐ প্রণালীতেই সম্প্রতি তোমার যাহা চাই, তাহা আকর্ষণ করিতে থাকিবে। কোথা হইতে আসিবে, কেমন করিয়া আসিবে, তাহা ভাবিবার তোমার কোনই প্রয়োজন নাই। মানুষের চোখের ও বুদ্ধির নিকট যাহা অসম্ভব মনে হয়, অনেক সময়ই তাহা আশ্চর্য্যরূপে ঘটিয়া থাকে, ইহা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছ; অযাচিত অনুগ্রহ, অযাচিত সাহায্য, অযাচিত বন্ধুতা সকলেই অল্পবিস্তর পরিমাণে পাইয়া থাকে। কাজেই পথ আছে কি নাই তাহা না ভাবিয়া, আকর্ষণ করিতে থাকিবে এবং মানস চোখে আপনাকে ঈপ্সিতের অধিকারিরূপে দেখিতে থাকিবে।

সংসারে যে কাজ করিতেছ তাহাই যথাশক্তি সুচারুরূপে করিয়া যাইতে থাক—ইহাতেই আমার মঙ্গল হইবে ভাবিয়া ও বিশ্বাস করিয়া চঞ্চল মনটাকে সংযত করিতে থাকিও—দেখিবে, অচিরেই সিদ্ধি তোমার করতলগত হইয়াছে।

একটা কথা বলিতে পার, মন যখন অন্তরাত্মায় লয় পাইয়া যাইবে, তখন সাংসারিক অভাব ও অসুবিধা দূরীকরণের যে ইচ্ছা তাহা কোথা হইতে আসিবে? ভগবান্ পূর্ণ—অভাব তাঁহার নাই, অভাব-বোধও তাঁহার নাই, তথাপি তাঁহার প্রাণে ইচ্ছার উদ্রেক হইয়া অবিরত সৃষ্টি কার্য্য চলিতেছে। ইচ্ছার পর ইচ্ছা তাঁহার প্রাণে আপনা হইতেই—স্বভাবধর্ম্মে—উদিত হইয়া তখনই পূর্ণ হইতেছে। ঠিক সেই কারণে তোমার প্রাণেও ইচ্ছার পর ইচ্ছা উঠিয়া আপনাকে সার্থক করিতে থাকিবে। বিশেষতঃ, সর্ব্বদা আর তুমি ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিবেনা, সংসার—ক্ষেত্রে চলাফেরা করিতে যাইয়া অনেক সময়ই অনেক অভাব বোধ করিতে থাকিবে। মনটা মঙ্গলের দিকে ছুটিয়া গিয়াছে বলিয়া এখন আর দুঃখের কথাটা, অভাবের বেদনাটা হৃদ্‌পিণ্ডটাকে আঁকড়িয়া ধরিবে না—বিদ্যুৎ-ঝলকের মত বিপরীত মঙ্গলের কথাটা মনে হইয়া একেবারে অন্তরাত্মার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইবে, এবং মঙ্গল-ভাণ্ডারের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সংযোগ সাধিত হইয়াছে বলিয়া, অবিলম্বে প্রার্থিত মঙ্গল আনিয়া তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবে।

সর্ব্বদা, শ্বাসেপ্রশ্বাসে, কাজ করিবার জন্য তোমার ধ্যেয়

যাহাদ্বারা জড় জগতের পরিমাণ করিতে, কার্য্যকারণ বুঝিতে পারা যায় তাহারই নাম মায়া। যেদিন মায়ার অর্থবিভ্রম ঘটাইয়া তুমি আপনার স্বাধীন ইচ্ছার কথা ভুলিয়া গেলে, 'স্ব-ধর্ম্ম' ত্যাগ করিয়া জড় জাগতিক বিধানের, মায়ার, প্রভুত্ব স্বীকার করিলে—'পরধর্ম্ম' গ্রহণ করিলে, সেইদিন হইতেই তোমার দুঃখের সৃষ্টি হইল। অতএব দেখিতেছ ভগবান্ কেবলই মঙ্গল এবং তুমি নিজে অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছ। সুতরাং ভগবানের কল্পনায় মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গল মিশ্রিত করিওনা। মায়ার অধীন হইয়া মঙ্গলময়ের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করিয়াছ, স্বাধীন ইচ্ছার বিকাশ করিয়া আবার সেই সংযোগ সাধন কর; তবেই অমঙ্গল আপনা হইতেই লয় পাইয়া যাইবে। মঙ্গল-অমঙ্গলের অতীত অবস্থা লাভের জন্য কিংবা অমঙ্গল বিনাশ করিয়া মঙ্গল প্রাপ্তির জন্য যতক্ষণ তুমি চেষ্টা করিবে ততক্ষণ তুমি মায়ারই রাজ্যে। কাজেই 'তুরীয়েই' লক্ষ্য রাখ অথবা 'ইষ্টসিদ্ধিরই' চেষ্টা কর—উভয় চেষ্টাই তুল্যরূপে ব্যর্থ হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

আসন, প্রাণায়াম ও দৈনিক সাধন

যে অমৃত পান করিয়া দেবতারা অমর হইয়াছেন, আমরাও সেই অমৃত সাগরেই ডুবিয়া রহিয়াছি; কিন্তু 'অমৃত' বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিনা, এবং অবিশ্বাসে ও অবিচারে যে টুকু পান করিতেছি, সেটুকুও আমাদের দেহের নিত্যকার প্রয়োজনই সাধন করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা, অমরত্ব দান করিবে কোথা হইতে?—কাজেই আজ মাথা বেদনা, কাল কোষ্ঠ-কাঠিন্য, পরশ্ব প্রস্রাবের পীড়া, এই ভাবে ব্যাধির পর ব্যাধি এবং এক সঙ্গেও বহু ব্যাধি উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে জীবনের সুখে বঞ্চিত এবং মৃত্যুর জন্য লালায়িত করিয়া থাকে। অথচ অমৃত সাগরেই আমরা ডুবিয়া রহিয়াছি!

সমবেত গুণগুলির তুমি একটা নামকরণ করিয়া লইতে পার এই নামই হইবে তোমার মন্ত্র। কিন্তু সাবধান, নাম বা রূপ যেন কোন সময়ই অভিলক্ষিত পদার্থ হইতে দূরে সরিয়া না যায়। যখন নাম করিবে—যখন মানস চোখে রূপ দেখিবে, তখনই যেন সঙ্গে সঙ্গে গুণগুলির কথা মনে জাগিয়া ওঠে। তবেই মন্ত্রজপ ও প্রতিমা পূজা সার্থক হইবে।

যদিও মুখে বল ভগবান্ মঙ্গলময়, মনে কখনই তাহা বিশ্বাস কর না। তাই তোমার 'ধ্যানে' মঙ্গল ও অমঙ্গল এই উভয়েরই সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ধ্যান অনুসারে যে মানস অথবা মৃণ্ময় প্রতিমা গড়িয়া লও, তাহাতে বিপরীত গুণেরই আরোপ করিয়া ভগবানের ভাণ্ডার হইতে বিপরীত বস্তুই আকর্ষণ করিয়া থাক। একদিকের হাত দিয়া তোমার দেবতা তোমাকে 'বর ও অভয়' দান করেন বটে, কিন্তু অপর দিকের হাত তাহার তোমার শত্রু বিনাশে উদ্যত। কাজেই মঙ্গল ও অমঙ্গল এই উভয়ের ভাব লইয়াই তোমার দেবতা গঠিত, এবং তাহার নিকট হইতে তুমি অমঙ্গল-মিশ্রিত মঙ্গল ভিন্ন অবিমিশ্র মঙ্গল কখনই পাইতে পার না। তাই এ পথের 'সিদ্ধ' মহাপুরুষদিগকে রোগশোকতাপ এবং অকালমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে দেখা যায়না। তাহাদের হাসির রোলের সঙ্গে কান্নার সুর যখন তখন বাজিয়া উঠিয়াছে।

তাই বলিতেছি, ভগবান্‌কে তুমি যে নাম বা রূপ দিবে, তাহা যেন অবিমিশ্র অনন্ত মঙ্গলের চিত্রটাই তোমার মনে ফুটাইয়া রাখে। বাস্তবিক তিনি কেবলই মঙ্গলময়, তিনি তোমাকে তাঁহার নিজেরই চৈতন্যে চৈতন্যময় ও স্বাধীন ইচ্ছায় ইচ্ছাময় করিয়া সৃজন করিয়াছেন। জ্ঞাতসারে সেই স্বাধীন ইচ্ছার পরিচালনা করিলে আনন্দ বই বিষাদের স্থান কোথায়? নির্দ্দিষ্ট ও অলঙ্ঘ্য নিয়মের দ্বারা জড় জগৎ শৃঙ্খলিত। সেই নিয়মেরই নাম তুমি 'মায়া' রাখিয়াছিলে—"মীয়তে অনয়া ইতি মায়া,"

শ্বাসে শ্বাসে আমরা বায়ু টানিয়া ভিতরে আনিতেছি ও প্রশ্বাসে প্রশ্বাসে ছাড়িতেছি। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝিতে আমাদের কোনও চেষ্টা, কিংবা ক্রিয়াটা ভালরূপ চলিতেছে কিনা সে দিকে আমাদের আদৌ লক্ষ্য নাই অথচ শ্বাসে আমাদের জীবন—প্রশ্বাসে আমাদের মৃত্যু! একবার যখন ভিতরের বায়ু বাহির হইয়া যায় এবং বাহিরের বায়ু আর ভিতরে প্রবেশ করেনা, তখন কিন্তু চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া যায়। তবুও এদিকে আমাদের লক্ষ্য নাই!

বিজ্ঞ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা কর—তিনি বলিবেন, বায়ুতে যে অম্লজান আছে, তাহাই তোমার জীবন। তোমার ফুস্‌ফুসে ৭০½ কোটি হইতে ৮০ কোটি বায়ু-কোষ আছে। সাধারণতঃ যে ভাবে শ্বাস গ্রহণ করা হয়, তাহাতে পুরুষের অর্দ্ধেক এবং স্ত্রীলোকের একচতুর্থাংশ বায়ু-কোষ মাত্র অম্লজানে পূর্ণ হয়! ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে, কেন এত ব্যারামে ভোগ এবং কেনইবা এত অকাল মৃত্যু ঘটে।

সাধারণ শ্বাসে মাত্র ½ পাইণ্ট পরিমিত অম্লজান ভিতরে প্রবেশ করে। জোরে শ্বাস টানিয়া লইয়া সকলগুলি বায়ু-কোষ পূর্ণ করিলে কিপরিমাণ অম্লজান যাইয়া যে তোমার জীর্ণ দেহে জীবনী-শক্তির পুষ্টি ও বৃদ্ধি করিবে, তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পার।

প্রতি মিনিটে রক্ত তিনবার করিয়া আমাদের ফুস্‌ফুসের মধ্য দিয়া চলাচল করে ও এখান হইতে অম্লজান গ্রহণ

করিয়া আপনি সতেজ ও সজীব হয় এবং দূষিত বায়ু ঠেলিয়া লইয়া বাহ্যে প্রস্রাবের পথে বাহির করিয়া দেয়। এই ভাবে রক্ত দুই হাজার মাইল দীর্ঘ পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া, শরীরের যন্ত্রগুলি সুস্থ, সবল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া রাখে।

রক্তে যদি প্রয়োজন-অনুরূপ অম্লজান না থাকে, তবে রক্ত নিজেই দূষিত হইয়া পড়ে এবং শরীর-যন্ত্রগুলিও যথাযথ ভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া উঠিতে পারে না। ফলে শীঘ্রই মাথা ঘোরা, পেটফাঁপা, প্রস্রাবের ব্যারাম, প্রভৃতি ব্যাধি দেখা দিতে আরম্ভ করে। জীবন ত' খাটো হইয়া পড়েই—যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকা যায়, সে কয়দিনও বাঁচিয়া সুখ হয় না।

এই জন্য এমন ভাবে শ্বাস টানিতে ও প্রশ্বাস ফেলিতে হইবে যে একদিকে যেন প্রচুর পরিমাণে অম্লজানরূপ অমৃত পান করিয়া আমরা সুস্থ, সতেজ ও দীর্ঘজীবী হইতে পারি এবং অপরদিকে সহজে ও শীঘ্র ভিতরকার দূষিত পদার্থগুলি প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ বাহির করিয়া দিয়া রোগের সম্ভাবনাও দূর করিতে পারি।

শরীরের সঙ্গে মনের যে নিকট সম্বন্ধ, তাহা সকলেই জান। শরীর অসুস্থ ও অকর্ম্মণ্য হইলে মনও ক্রমে সেইরূপই হইয়া থাকে। এই ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে পরোক্ষ ভাবে মানসিক বৃত্তিগুলির হ্রাস-বৃদ্ধিরও একটা সম্বন্ধ আছে।

ইহা ছাড়া একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিবে, একটা প্রত্যক্ষ

সম্বন্ধও আছে। ক্রোধ কাম প্রভৃতি রিপুগুলি যখন প্রবল হয়, তখন শ্বাস খাটো এবং মন্দমন্দ হইয়া আসে; অম্লজান তখন অতি অল্প পরিমাণেই ভিতরে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যদি জোরে জোরে শ্বাস টানিয়া লইতে অভ্যাস কর, তবে অম্লজানের চাপে এই রিপুগুলি ক্রমেই নিস্তেজ হইতে আরম্ভ করিবে; এবং যখনই তাহারা মাথা তুলিতে চাহিবে, তখনই তাহাদের বিপরীত বস্তুর চিন্তা করিতে করিতে জোরে শ্বাস টানিয়া ভিতরে যতটা পার অম্লজান টানিয়া লইও। তবে আর তাহারা তোমাকে আকুল করিয়া তুলিতে পারিবেনা।

খাদ্য দ্রব্য দিয়া পেটটা তুমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বোঝাই করিয়া রাখিতে পার। কিন্তু অম্লজান সে ভাবে মজুত করিয়া রাখা চলে না। কাজেই সর্ব্বদাই ইহা আকর্ষণ করিতে হইবে।

এই যে অম্লজান আকর্ষণ করা, ইহারই নাম প্রাণায়াম।

মুক্ত বাতাসে বসিয়া, বক্ষদেশ বিস্তৃত করিয়া, ধীরে ধীরে তালে তালে যতদূর পার শ্বাস টানিয়া লও। প্রথমে তলপেট তারপর নাভিদেশ, এই ভাবে ক্রমশঃ কণ্ঠ পর্য্যন্ত বায়ুতে পূর্ণ হইবে। তারপর কতটুকু সময় (যতক্ষণ অনায়াসে পার) দমবন্ধ করিয়া অম্লজানরূপ অমৃতটাকে ভিতরে বহাইতে চেষ্টা কর, এবং শেষে ত্রস্ত ভিতরকার বাতাস ছাড়িয়া দাও—কণ্ঠ দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া তলপেট পর্য্যন্ত যেন পরিষ্কার হইয়া আসে। শ্বাস টানিবার সময় মুখ বন্ধ করিয়া (দাঁতে দাঁত দিয়া

থাকিবার কোনই প্রয়োজন নাই) নাসা-পথে অম্লজান গ্রহণ করিবে। প্রশ্বাসের সঙ্গে দূষিত পদার্থ বাহির হয় বলিয়া, যত তাড়াতাড়ি বাতাসটা ছাড়িয়া দেওয়া যায় ততই ভাল ; তাই নাক এবং মুখ উভয় পথেই বাতাস ছাড়িতে থাকিবে।

যখন সুধু অম্লজান গ্রহণের জন্য প্রাণায়ামের কাজ করা হয়, তখন দাঁড়ানো এবং হাঁটা অবস্থায়ও করা যায়। কিন্তু যখন মনকে দমাইয়া অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করাই উদ্দেশ্য, তখন বসিয়া (ও শুইয়া) কাজ করা সঙ্গত। আসন সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। যে ভাবে বসিয়া (শুইয়াও) তোমার আরাম বোধ হয়, পিঠ চড়চড় করিয়া তোমার মনটাকে ব্যথিত স্থানের দিকে টানিয়া লইয়া যায় না, সেই ভাবে বসিবে। চক্ষু মেলিয়া বা বুজিয়া যে ভাবে ইচ্ছা ভাবিতে পার। নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। মন যখন ভিতরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিবে, তখন বাহ্য জগৎ আর বিশেষ বিঘ্ন জন্মাইতে পারিবে না। যদি এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টি যাইতে চায়, তবে চক্ষু বুজিয়া বসিও।

মনটাকে স্থির করিয়া আনিবার জন্য প্রথমে তাহাকে শ্বাসের দিকে লক্ষ্য করিতে শিখাও। অম্লজান টানিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে থাকিও—যে অম্লজানে জীবন, যে অম্লজানের সাহায্যে আমার শরীর-যন্ত্রগুলি পুষ্ট হয় ও যথাযথভাবে কার্য্য করে, এই আমি সেই জীবন-স্বরূপ অম্লজান গ্রহণ করিতেছি। যখন দম বন্ধ করিবে, তখন চিন্তা করিবে, অম্লজান গ্রহণ করিয়া আমি

স্বাস্থ্য ও জীবন-স্বরূপ হইয়াছি। তার পরে যখন শ্বাস ত্যাগ করিবে, তখন মনে করিবে—আমিই স্বাস্থ্য, আমিই জীবন।

এই ভাবে কয়েক বার শ্বাস প্রশ্বাস করিবার পরেই ভিতরে একটী নূতন বল, নূতন আশা অনুভব করিবে। তখন ধীরে ধীরে ঈপ্সিতের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিও।

প্রথমে শ্বাস টানিবার এবং প্রশ্বাস ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবিতে থাকিও, মঙ্গলময় বিশ্বেশ্বরে সুপ্রতিষ্ঠিত আমি, তাঁহারই আশ্রিত আমি, তাঁহারই অংশ আমি, তাঁহা হইতে অভেদ আমি! অতএব আমিও মঙ্গলময়—আমিই মঙ্গল।

তারপরে, তোমার ঈপ্সিত গুণের সমবায়ে যদি মূর্ত্তি কল্পনা ও তাহার নামকরণ করিয়া থাক, তবে সেই মূর্ত্তির উপর মানস দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, অথবা একে একে সেই গুণগুলি স্মরণ করিতে করিতে, শ্বাস টানিতে থাকিও, এবং প্রশ্বাস ফেলিবার সময় মূর্ত্তির যে নাম রাখিয়াছ, মূর্ত্তির উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, মনে মনে বলিতে থাকিও, আমিই সেই (নাম), আমিই সেই।

আবশ্যক হইলে, কল্পনা বিশেষ ভাবে উত্তেজিত করিবার জন্য, ইহার পূর্ব্বে, শ্বাসে ও প্রশ্বাসে, তোমার ঈপ্সিত গুণগুলির পরমবিকাশের যে সকল ঘটনা তুমি শুনিয়াছ, পড়িয়াছ বা দেখিয়াছ, তাহার কথা কিয়ৎকাল ভাবিয়া লইও।

তার পরে শ্বাস টানিবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে থাকিও—দেখিতে চেষ্টা করিও—যে, সেই ঘনীভূত উজ্জ্বল গুণরাজি বা মূর্ত্তি হইতে অবিরত অজস্র ধারায় তোমার উপর সেই সকল গুণ

বর্ধিত হইতেছে; এবং প্রশ্বাস ফেলিবার সময় মনে মনে বলিতে থাকিও,আমি অনন্ত মঙ্গল,অনন্ত ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি (যে যে গুণ তোমার ঈপ্সিত, ক্রমান্বয়ে সেই সেই গুণের সঙ্গে আপনার অভেদ অবস্থা বলিয়া যাইও)

কয়েকবার এই ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস টানিতে টানিতেই তোমার মন নিস্তেজ হইয়া অন্তরাত্মার দিকে ছুটিয়া চলিবে; প্রাণে আশা, উৎসাহ, বল ও বিশ্বাসের সঞ্চার হইয়া তোমাকে নূতন তেজে উদ্দীপিত করিবে। এখন হইতেই ধীরে ধীরে মঙ্গলের স্রোত তোমার অলক্ষ্যে তোমার উপর প্রবাহিত হইতে থাকিবে, উদ্যত বিপদের বজ্র আপনা হইতেই সরিয়া যাইতে থাকিবে। শেষে যে দিন এই ভাবে বসিয়া বহির্ম্মুখী মন একেবারে অন্তরাত্মায় লয় করিয়া ফেলিবে, সেই দিনই তোমার অভীষ্ট গুণরাজির অনন্ত অপরিমেয় ভাণ্ডার অনন্তকালের জন্য তোমার করতলগত হইবে। জগতে দিনরাত্রি সমানভাবে হইতে থাকিলেও, অনন্ত তেজোময় সূর্য্যকে—তোমার অমোঘ ইচ্ছা-শক্তিকে—ধরিয়া রহিয়াছ বলিয়া, তোমাকে আর রাত্রি অনুভব করিতে হইবে না। তোমার মোক্ষ, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, লাভ হইবে।

এই পরম সিদ্ধি লাভ করিতে উদ্যত হইয়াও খণ্ড সিদ্ধির দিকে তোমার মন আকৃষ্ট হইতে পারে। ঘরে চাউল নাই —অন্ন চিন্তা তোমাকে সাধনার সময়ে ব্যাকুল করিতে পারুক আর নাই পারুক, অন্য সময়ে ব্যাকুল করিতে চাহিবেই

চাহিবে। অবশ্য, তুমি যে পরম সিদ্ধি আকর্ষণ করিতেছ, তাহার টানে তোমার ক্ষুদ্র সাময়িক ইচ্ছাগুলি পূরণের পথ আপনা হইতেই সহজ হইয়া আসিবে। তাহা হইলেও, ব্যাকুলতা এবং প্রয়োজন যদি বেশি হয়, পরমসিদ্ধি—অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি—আকর্ষণ করিবার পরে বিশ্বেশ্বরের ভাণ্ডার হইতে শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রয়োজনীয়-রূপ দ্রব্য আসিতেছে বলিয়া কল্পনা করিতে থাকিবে এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে আসিয়াছে বলিয়াই মনে করিবে। এবং যখনই চিত্ত ব্যাকুল হয়, তখনই কয়েকবার আমি সাম্য আমি সাম্য, আমি শান্তি, আমি শান্তি বলিয়া প্রাণায়াম করিয়া, কল্পনায় আপনাকে ঈপ্সিত বস্তুর অধিকারিরূপে দেখিতে চেষ্টা করিবে। এই ভাবে যথারীতি কার্য্য করিলে, পরম সিদ্ধি লাভের পূর্ব্বেও, খণ্ড ইচ্ছার সিদ্ধি হইতে থাকিবে। তাহার ফলে আশা ও বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া পরম সিদ্ধিলাভের পথও সুগম করিয়া তুলিবে।
